

বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন

শ্রী চারুবিকাশ দত্ত

বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন

শ্রী চারুবিকাশ দত্ত

বিপ্লবীদের কথা

বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন ২

বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন

প্রকাশক
বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা
২ কমরেড মণি সিংহ সড়ক, মুক্তিভবন নিচতলা
(কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়) পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
সেল: ০১৭২৬-১২৩৫৫০, rafiqcpb@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ
মেহেদী বানু মিতা

মেকআপ
বিপ্লবীদের কথা

বর্ণ বিন্যাস ও বানান শুদ্ধিকরণ
বিপ্লবীদের কথা

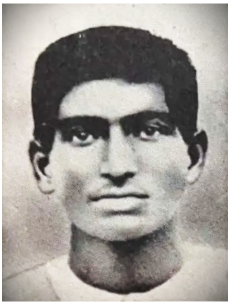
ছেপেছেন
মাটি ও মানুষ, ১১০ আলিজা টাওয়ার, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

বাঁধাই
রবিন অ্যান্ড ছোঁয়া বুক বাউন্ডিং, ২৪৫/এ ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

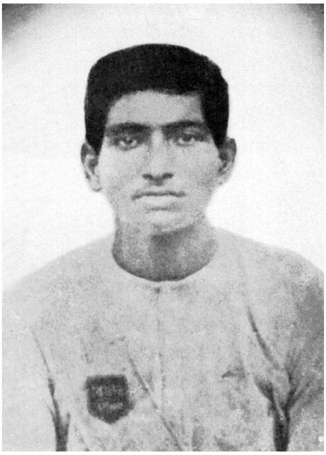
ISBN: 978-984-8875-028

মূল্য: আশি টাকা

উৎসর্গ



বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন



শ্রী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী



শ্রী অনন্তহরি মিত্র



ফাঁসির মঞ্চ

বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন

শ্রী চারুবিকাশ দত্ত

কলকাতার ১৯৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিটের মহামায়া প্রেসে মুদ্রিত ও একই ঠিকানায়, বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে ব্রজবিহারী বর্মণ কর্তৃক প্রকাশিত। ১৯২৯ সালের ১৫ই আগস্টের এক গেজেট ঘোষণায় গ্রন্থটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-এ ধারা মতে বাজেয়াপ্ত হয়।



শ্রী চারুবিকাশ দত্ত

ভূমিকা

মুক্তির মন্দির সোপান তলে

কত প্রাণ হলো বলিদান...

আজকের তরুণপ্রজন্ম কতটুকু জানে– সেই সমস্ত বিপ্লবীদের সম্পর্কে, যারা জীবন দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছিল! তাদের একজন প্রমোদরঞ্জন। যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর বিপ্লবী জীবন নিয়ে 'বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন' বইটি লিখেছিলেন তাঁরই সহযোদ্ধা বিপ্লবী চারুবিকাশ দত্ত।

ইংরেজ আমলে নিষিদ্ধ বিভিন্ন বইয়ের সংকলন নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১৫ই আগস্ট 'ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে কলকাতার 'এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি'। বইটির প্রকাশক ছিলেন শ্রীমতী গীতা দত্ত। 'বিদ্রোহী বীর প্রমোদরঞ্জন' বইটি 'ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই' থেকেই নেয়া হয়েছে।

বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। তাই এই বইটকে তরুণপ্রজন্মের কাছে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ অনুভব করেই পুণঃমুদ্রণ করা হলো।

বইটি পুণঃমুদ্রণের বর্ণ বিন্যাস ও বানান সংশোধন করেছেন নবনীতা সাহা তপু। এজন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বানানরীতি আগের বই অনুসারে রাখা হয়েছে। সতর্কতা সত্ত্বেও এই বইতে মুদ্রণজনিত কোনো অসঙ্গতি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। সচেতন পাঠক কোনো ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

শেখ রফিক
০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩
ইকুরিয়া, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা

সূচনা

‘গর্ব যাদের স্বদেশ-সেবা, মুক্তি যাদের–জীবন-দান,
পাথেয় যাদের–পথের-কাঁটা, নিন্দা, গ্লানি অপমান;
আজকে জাতির ইতিহাস নিয়েছে তাদের পূজার ভার;
মৃত্যু-পাগল মুক্তিকামী! লওগো জাতির নমস্কার!’

প্রমোদরঞ্জনের শৈশব ইতিহাসের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত নহি। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত কেলিশহর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ‘কেদার বংশে’ তাহার জন্ম হয়। বংশের এই আদি-পুরুষের নামানুসারে তাহার ডাক নাম ছিল কেদার। এই বংশের আভিজাত্যের গৌরব চট্টলবাসীর অবিদিত নাই। প্রমোদরঞ্জন সম্ভ্রান্ত ধনীসন্তান। এই বড়ো ঘরের বড়ো সংসারে মানুষ হইয়াও সে বড়োমানুষী চালচলনে কোনোদিনই অভ্যস্ত ছিল না; ইহাই ছিল তাহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। এখানে আমরা তাহার ধারাবাহিক জীবনী আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব না। হয়তো তাহার আবশ্যকতাও নাই। যে আদর্শের প্রেরণা তাহাকে ঘরছাড়া করিয়াছিল, চরিত্রের যে বিশেষত্বটুকুতে সে আজ মরণের গৌরবে অমরত্ব লাভ করিয়া পরাধীন দেশের যুবজনের আদর্শ প্রাণ-পুরুষদের পাশে স্থান করিয়া লইয়াছে আমরা আজ কেবল সেটুকুই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

তাহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহার গোপন বিপ্লব-জীবনের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টার যে সতর্ক ইঙ্গিত তাহার অন্তরঙ্গগণের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে এবং উত্তরকালে সরকারের আদালতে সরকারপক্ষের কথায় যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমাদিগকে এখানে তাহার উপরই নির্ভর করিয়া সংযতভাবে চলিতে হইবে। আমাদের সংযমের উৎস- একদিকে তাহার সাথের-সাথি অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ, যাঁহারা তাঁহাদের গুপ্ত বিপ্লব-সমিতির কর্মপ্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক, অন্যদিকে সদাজাগ্রত হুঁশিয়ার বিদেশি সরকার– যাঁহারা পরাধীন দেশের সমস্ত মুক্তিপ্রচেষ্টা ও তাহার অধিনায়কগণকে সাধারণের সুদৃষ্টি হইতে ছলে-বলে-কৌশলে নির্মম শাসনের চাপে ঢাকিয়া রাখিতে বা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর। কাজেই এই উভয়বিধ বাঁধার বাঁধে ঠেকিতে ঠেকিতে আমরা কতদূর কৃতকার্যতার সহিত অগ্রসর হইতে পারিব তাহার বিচারভার বুদ্ধিমান দরদীগণের উপরই রহিল।

প্রমোদরঞ্জনের প্রসঙ্গে অনেক সময় তাহার সাথের-সাথিদিগকেও বাদ দেওয়া চলিবে না; কারণ জীবন-মরণ-সূতার পরে যাহারা গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়া পরস্পরের সঙ্গে আমরণ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল একটিকে গ্রন্থিচ্যুত করিতে গেলে অতি সাবধানীও নিকটতমের স্পর্শ হইতে রেহাই পায় না- তবে যে দেশের স্বদেশ-সেবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ফাঁসি-কাষ্ঠ তাহার সাথের সাথিরা সে পোড়া-দেশেরই অধিবাসী বলিয়া আমরা এখানে তাহাদের সঠিক নামধাম গোপন রাখিব। যেখানে কাহারও নামোল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন আমরা কাল্পনিক মনগড়া নামই উল্লেখ করিব। চট্টগ্রামের বিপ্লবকর্মী প্রমোদরঞ্জনের প্রসঙ্গে তখনকার চট্টগ্রামের বিপ্লবসমিতির অভ্যন্তরীণ অবস্থাও একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার।

সরকারের কঠোর আইনে নিষ্পেষিত বাংলা দেশের স্বদেশি-আন্দোলন বাহ্যপ্রকাশের সুযোগ না পাইয়া কিভাবে শনৈঃ শনৈঃ গোপন-মূর্তি ধারণ করিয়াছিল দেশবাসীর তাহা অবিদিত নাই। বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলায় কতদূর ব্যাপকভাবে গুপ্ত বিপ্লব-সমিতি শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিল তাহা রাউলেট কমিটির রিপোর্টে ও ১৯১৬ সালের ‘ভারতরক্ষা আইন’ অনুসারে বিভিন্ন জেলা হইতে ধৃত শিক্ষিত বাঙালি যুবকগণের সুদীর্ঘ তালিকা হইতেই অনেকটা অনুমিত হইয়াছে।

যখনকার কথা বলিতেছি তখন সবেমাত্র ইউরোপের মহাসমরের অবসান হইতে চলিয়াছে। ইতিপূর্বে সরকারের ধর্ষণনীতির ফলে প্রায় সমস্ত বিপ্লবসমিতিই এক প্রকার ভাঙিয়া গিয়াছে। কেন্দ্রের ছোটোবড়ো নেতৃগণ প্রায় সকলেই ধৃত হইয়া সরকারের কারাগারে বন্দি, এতদিন যে সারাদেশ জুড়িয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ সঙঘ লইয়া একটি বিরাট সঙঘ (organization) গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ এ অবস্থায় তাহাদের যোগসূত্র (link) ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ‘এক কেন্দ্রের সঙ্গে অন্য কেন্দ্রের সম্বন্ধ পর্যন্ত নাই, বিপ্লব-সমিতিতে যাঁহারা তখনও কাজের কাজি হইয়া উঠেন নাই অথচ স্থানীয় নেতৃগণের সঙ্গে যাঁহাদের সতর্ক, গোপন সম্পর্কমাত্র ছিল’। তাঁহারাই কোনোমতে টিকটিকি পুলিসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া কাজে বিপ্লবী না হইলেও প্রাণে-প্রাণে বিপ্লবী হইয়া সেই ভাঙা হাটের করুণ দৃশ্য দেখিতে অবশিষ্ট রহিলেন। কেহ কেহ প্রাণপণ চেষ্টায় কোনোমতে জোড়াতালি দিয়া স্থানীয় বিপ্লবসমিতিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছিলেন এই আশায় যে সুদূর ভবিষ্যতে বিশিষ্ট কর্মীগণ মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলে হয়তো আবার পথের সন্ধান মিলিবে। তখন যাঁহারা নগণ্য ছিলেন তাঁহারাই গণ্য হইলেন, যাঁহারা নবীন ছিলেন আজ দায়ে ঠেকিয়া তাঁহারাই প্রবীণ হইয়া উঠিলেন।

তখন বাংলাদেশে ছোটোবড়ো যতগুলি বিপ্লবসমিতি ছিল শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতি তাহার অন্যতম। এই অনুশীলন সমিতির সহস্রমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাসে রাউলেট কমিটি রিপোর্ট ভরপুর। তখনকার দিনে বাংলাদেশে ও ভারতের বিভিন্ন জেলায় এমন ব্যাপকভাবে বিপ্লবকেন্দ্রের জাল বুনিয়া এমন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলায় সঙ্ঘ গঠনে অনুশীলন সমিতির সমকক্ষ কোনো বিপ্লব-সমিতি ছিল কিনা আমরা জানি না। ইহার প্রতাপ, দুর্ধর্ষতা ও ব্যাপকতা সরকারি রিপোর্টে সালঙ্কারে স্বীকৃত হইয়াছে। ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া এই বিরাট বিপ্লবসঙ্ঘের নেতৃবৃন্দকে কারাগারের কুক্ষিগত করিতে শক্তিমান গভর্নমেন্টকেও অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে। উচ্চ আদর্শবাদের ভিতর দিয়া শক্ত মানুষ গঠনে এই অনুশীলন সমিতি এমনি সিদ্ধহস্ত ছিল যে বিশিষ্ট নেতৃগণের অনুপস্থিত কালে অনেক অজ্ঞাত সাধারণ কর্মীও বিশেষ দক্ষতার সহিত নিজেদের আদর্শ বজায় রাখিয়া বিপ্লবসঙ্ঘকে কোনওমতে জিয়াইরা রাখিতে পারিয়াছিল। অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা, কৌশলী নেতা—একনিষ্ঠ দেশসেবক— সরকারের ভাষায় সেই Notorious পুলিনের নাম আজও বাংলাদেশের প্রাচীন, নবীন সবারই প্রাণে বীরত্বের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। বলাবাহুল্য, চট্টগ্রামের বিপ্লবসমিতিও এই অনুশীলন সমিতিরই শাখা কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সরকারের কঠোর নিষ্পেষণের ফলে ক্ষুদ্র, বৃহৎ সমস্ত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের অবস্থাই মর্মন্তুদ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

চট্ট্রগামের বিপ্লবকেন্দ্রের অবস্থাও এবম্প্রকার। এখানেও স্বল্পবিশিষ্ট কর্মীগণের মধ্যে যিনি একটু বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান, বিপ্লবসঙ্ঘের পরিচালন ভার তাঁহার উপরেই পড়িয়াছিল। তিনি অল্প কয়েকজন সহযোগী লইয়া পুনরায় সঙ্ঘ গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে ফল এই হইল যে সমিতির মধ্যে শৈথিল্য বা হতাশা আসিবার সুযোগ রহিল না। সমিতির গোপন-বন্ধনও শ্লথ হইয়া খসিয়া পড়িল না। কিন্তু নিষ্ঠুর ভবিতব্যতার কি অভিপ্রায় জানি না একদিন হঠাৎ তিনি তাঁহার সহকর্মীদের আহ্বান করিয়া গুপ্ত-বিপ্লবসমিতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিলেন এবং সেই দিন হইতেই বিপ্লবসমিতির সমস্ত দায়িত্বভারও ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই আচরণে অনেকেই মনঃক্ষুন্ন ও হতাশ হইলেন। সমকর্মীদের মধ্যে কেহ কেহ সাময়িকভাবে বিপ্লবকার্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়া ধীরে ধীরে কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিলেন। আর একশ্রেণীর যুবক নতুনভাবের প্রেরণায় গা ভাসাইয়া দিয়া অধ্যাত্মসাধনার আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতা তাঁহাদের

মনকে আলোড়িত করিয়া বিপ্লব-পথ হইতে দূরে রাখিল কিনা তাহার আলোচনা আমরা এখানে করিব না। এ সময়ে প্রায় সকলেই যেন কি এক নবীন মহাভাবের ভাবুক হইয়া উঠিলেন; সমিতির সংশ্লিষ্ট যুবক ও কিশোরবয়স্ক বালকগণ স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভাসিয়া চলিল। এ নিরুপদ্রবভাবের তরঙ্গ রোধিবে কে?

মাত্র দুই চারিজন হৃদয়বান অজ্ঞাতনামা যুবক যাহারা এতদিন পত্রবাহকের কার্য করিয়া বা নেতৃগণের মুখে বিপ্লবযোগ্য জীবন গঠনের উপদেশাদি লাভ করিয়া বা সাধারণ সৈনিকের মতো সঙ্ঘের নেতৃগণের আদেশাদি পালন করিয়াই নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করিত আজ এই দুর্দিনে তাহারাই আসরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য তেমন ছিল না– সুদিনে সমিতির কার্যে তাহাদের কোনও বিশিষ্টস্থানও হয়তো ছিল না। বিপ্লবসমিতির পরিচালক হইবার যোগ্যতা যে তাহাদের ছিল না একথা তাহারা নিজেরাও বুঝিত, কেবল বুঝিত না যে কি করিয়া রাজনৈতিক মুক্তির পথ হইতে সরিয়া গিয়া, এতদিনের ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনার হাত হইতে চিরতরে নিস্কৃতি লইয়া জড়ভরত হইয়া বসিয়া থাকিবে। যাহাদের আপ্রাণ সাধনায় বিপ্লবসমিতিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ দৈববিড়ম্বনায় তাহাদের সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাহা দেশের বুক হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইবে এই চিন্তাটুকুই তাহাদের প্রাণের তারে ঘা দিতে লাগিল। এ সময়ে পশ্চাৎপদ হওয়া উচ্চ আধ্যাত্মিকতার বা গভীর বিজ্ঞতার পরিচায়ক কি না তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই, বরং তাহারা ইহাকে হৃদয়হীন উদাসীনতা বা মনের কোণে সঞ্চিত কাপুরুষতারই বাহ্যপ্রকাশ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাহাদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি হয়তো তখনও ছিল না, বিপ্লবসমিতি গঠনোপযোগী দক্ষতা বা তীক্ষ্ণ প্রতিভাও তাহাদের ছিল না। কিন্তু দূর ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া বিপ্লবসমিতিকে জিয়াইয়া রাখিতে যতটুকু সাধনা, যতখানি ত্যাগ ও নিষ্ঠার দরকার ততখানিই হয়তো তাহাদের ছিল। এতটুকু ছিল বলিয়াই মাত্র দুই চারিজন বন্ধুতে মিলিয়া শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অসীম ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বিপ্লবসমিতির পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিল। তন্মধ্যে দেবচরিত্র স্বর্গগত রাজবন্দি অনুরূপ চন্দ্র সেনের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নীরব কর্মী অনুরূপচন্দ্রের সঠিক নাম আজ দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিলাম, তাহাও সরকারের নির্মম অনুকম্পার ফলে। অনুরূপচন্দ্র ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে শেষভাগে সরকারের অবাধ স্বেচ্ছাতন্ত্র অর্ডিন্যান্স (ordience) আইনের কবলে

পড়িয়া কারাবাসে ও ময়নাগুড়ির জঙ্গলে অন্তরিনের থাকার বিচিত্র আরাম ও অভাবনীয় সুখসুবিধা ভোগ করিতে করিতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া স্বজনহারা-স্বজনছাড়া অবস্থায় তিলে তিলে নিজের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত এদেশের মাটিতে রাখিয়া বারাণসী ধামে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া চিরতরে শান্তি লাভ করিয়াছে– বলদর্পীর শক্তির গর্ব আর তাহার জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিবে না, ইহাই আজ আমাদের পরম সান্ত্বনা।

এদিকে অনুরূপচন্দ্র ও তাহার বন্ধুরা সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়ও সঙ্ঘগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, প্রাচীন কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা বিপ্লবসমিতির সমস্ত দায়িত্ব ভুলিয়া ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার বিধিব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন তাঁহারা এই নবীন কর্মীদের আসরে অবতীর্ণ দেখিয়া অসোয়াস্তি বোধ করিলেন, 'কেহবা হাসিল কেহ করিল ধিক্কার।' অবসরপ্রাপ্ত বন্ধুগণের উপহাস ও তীব্র মন্তব্যের কোনও সমালোচনা না করিয়া এই তরুণ কর্মীদল অসাধ্যসাধনে লাগিয়া গেল। অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদের তরুণ হৃদয় ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছিল, অভিজ্ঞতা ও নিপুণতার অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা অকৃতকার্য হইতেছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাণের মধ্যে যে উৎসাহের অফুরন্ত উৎস ছিল তাহা উছলিয়া উঠিয়া বাহিরের শত প্রতিকূলতাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত।

এই বিজন একা চলার পথে তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কতই না প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের জীবনের সৌন্দর্য ও সজীবতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্যর্থতার কষাঘাতে তাহারা নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া পুলকে গাহিয়া উঠিত 'নিশিদিন ভরসা রাখি, ওরে মন হবেই হবে।' এই তরুণ বিপ্লবসঙ্ঘের মধ্যে প্রায় সকলেই জ্ঞানে, বয়সে ও অভিজ্ঞতায় তরুণ ছিল। প্রায় ঠিক এমনই সময়ে সঙ্ঘের এই শোচনীয় দুর্দিনে, আড়ম্বরহীন অবস্থায় আমাদের প্রমোদরঞ্জন এই তরুণ বিপ্লব সমিতির কোনও এক বিশিষ্টকর্মীর সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে।

শ্রী চারুবিকাশ দত্ত

সূচি

ক্ষুদ্র পরিবারের বাহিরেও সারা দেশ জুড়িয়া একটা বিরাট পরিবার রহিয়াছে– তাহার প্রতি নিজের কর্তব্যের যেন ত্রুটি না হয়, আমি একজন যাইতেছি, তাতে কি? তোর তো আরও হাজার হাজার ভাই আছে। তাহারাই তোদের সুখ দুঃখের সহায় হইবে।

- প্রমোদরঞ্জন

প্রথম পরিচয়

'দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।'

সেদিন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের বর্ষামুখর অপরাহ্নে চট্টগ্রাম শহরের কোনো মেসের এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া তরুণ বিপ্লব-কর্মী বিমলবাবু তাঁহার অশৈশব বন্ধু, প্রমোদকুমার নামক এক যুবকের সহিত বসিয়া তাঁহাদের গতজীবনের কত ভূলে যাওয়া বর্ষা-সন্ধ্যা, কত হারিয়ে যাওয়া শরৎপ্রভাতের সুখস্মৃতিগুলি বিস্মৃতির অন্ধকার গর্ভ হইতে টানিয়া বাহির করিতেছেন, বিমলবাবু তাঁহাদের অতীত জীবনের ছোটোখাটো সুখস্মৃতির সূত্র ধরিয়া তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা আলোচনা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। নিজের এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে, আপনারজনকে সারা জীবনের দোসর করিতে না পারিলে ভাবে, চিন্তায় এক হইয়া কর্মপথে সমানে পা ফেলিয়া চলিতে না পারিলে এই অভিন্ন হৃদয় বন্ধুদ্বয় নিজেদের চলার পথে কতখানি বাধা সৃষ্টি করিবে বিমলবাবুই তাহা সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ না রাখিয়া দুইটি জীবনধারা পরস্পর বিরোধী স্রোতে বহিতে থাকিলে তাহাদের বুকভরা সরল প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত আজিকার এই মিলন-সৌধ অদূর ভবিষ্যতে অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে শ্রীহীন হইয়া উভয়ের বুকে দুর্নিবার ব্যথার স্মৃতিই জাগাইয়া রাখিবে মাত্র। নিজের জীবনে যা সত্য বলিয়া ধরা পড়িয়াছে, নিজের অন্তরঙ্গের মধ্যেও সে সত্যজীবন লাভ করুক ইহা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক অভিলাষ। এক্ষেত্রে বিপ্লববাদীরা– যাহারা দূরত্বের ব্যবধান সরাইয়া পরকে আপন করবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে তাহারা যে অন্তরঙ্গকে কাছে– একান্ত কাছে, পাইতে চাহিবে তাহা আর আশ্চর্য কি?

এইভাবে উভয়ে উভয়কে নিজের সত্যধারণামতো কাছে পাইবার চেষ্টায় উভয়ের আলোচনা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এদিকে দিনের আলো ক্রমশ মলিন হইয়া জানালার ফাঁকে সন্ধ্যার আগমন সংবাদ দিতেই প্রমোদকুমার সস্মিত মুখে 'আজকের মতো আসি' বলিয়াই বন্ধু কপোলদেশে স্নেহের হস্ত বুলাইয়া তড়িদ্বেগে শহরের রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। বিমলবাবু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চকিতে শূন্যপানে তাকাইয়া প্রমাদ গণিলেন। এতক্ষণ তাঁহার বুকের ভিতর

একটি ঝড় বহিতেছিল, বহির্প্রকৃতির দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন এখানেও শীঘ্রই একটি ঝড় উঠিবে। আকাশের বুকে একখানি বৃহদাকার নিবিড় কালো মেঘ–তাহারই কোণে বিদুল্লতার চঞ্চল কান্তিবিকাশ তাঁহার মনকেও চঞ্চল করিয়া তুলিল।

এই দুর্দিনে বন্ধুকে বাহিরে যাইতে দেওয়া কিছুতেই সমীচীন হয় নাই মনে করিয়া তিনি এক পা দুই পা করিয়া সদর রাস্তায় আসিয়া নিতান্ত ব্যাকুলকণ্ঠে 'প্রমোদ', 'প্রমোদ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দমকা হাওয়ায় কার একটি কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করিল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়াই দেখিলেন একজন দাঁড়াইয়া। তিনি তাহাকেই প্রমোদ মনে করিয়া বুকে টানিয়া লইলেন। সেই কালো-সন্ধ্যার কালো-মেঘের অন্ধকারে দুইটি অপরিচিত হৃদয় ভুলের মধ্যে বাঁধা পড়িল। যে বিদ্যুতের আলো মানুষের চোখে ভুলের সৃষ্টি করে সেই বিদ্যুতের আলোই আজ তাহাদের ভুল ভাঙাইবার প্রয়াস করিতেই অপরিচিত মুখ দেখিয়া উভয়েই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। উভয়ে দৃষ্টির সমস্ত শক্তি প্রয়োগে সেই সজল-সন্ধ্যার কোমল-কালো অন্ধকার ভেদ করিয়া পরস্পরের মুখের পানে নির্বাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিমলবাবু তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে এই অপরিচিত যুবকের নামের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুর নামের অপূর্ব সামঞ্জস্য আছে। তাই নিজের অমার্জনীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতে গিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, যে তিনি তাঁহার এক বন্ধুভ্রমে এই কাণ্ডটা করিয়া বসিয়াছেন। তখন এই অপরিচিত যুবকটি বলিয়া বসিল, 'ভুল করিয়া বন্ধু মনে করিয়াছেন, পরকে আপন ভাবিবার মতো ভুল জীবনে আমরা সত্যই খুব বেশি করিবার সুযোগ পাই না। এমন গৌরবময় ভুলটিকে আজীবন জিয়াইয়া রাখিলে কেমন হয়?' এই কথা কয়টি বলিয়াই সে স্বেচ্ছায় তাহার হাতখানিসুদ্ধ বিমলবাবুর হাতের মধ্যে ধরা দিল।

এই দুই একটি কথা হইতেই এই অপরিচিত যুবকটির হৃদয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে বিমলবাবুর একটা স্পষ্ট ধারণা হইয়া গেল। উভয়েরমধ্যে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চলিল। তখনই বিমলবাবু জানিতে পারিলেন, এই অপরিচিত যুবকটির নাম প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। সে স্থানীয় মিউনিসিপাল হাই-স্কুলে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে। সে সময় বিমলবাবুও স্থানীয় একটি হাই-স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। ইহা অবগত হইবামাত্র প্রমোদরঞ্জন ছাত্রসুলভ শ্রদ্ধায় তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে চাহিলেই বিমলবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'শিক্ষকের শ্রদ্ধা দিয়ে আমায় দূরে সরিয়ে না দিয়ে ভ্রাতৃপ্রেমের মধুরতা দিয়ে কাছে টেনে নিতে পারো না কি? এই বলিয়াই তিনি অসীম স্নেহে তাহাকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন।

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে বিমলবাবুর মেসের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাতির আলোতে পরস্পর পরস্পরকে আর একবার খুব ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। প্রমোদরঞ্জনের সরল চাহনি, সহজ কথাবার্তা, বলিষ্ঠ অঙ্গসৌষ্ঠব বিমলবাবুকে সত্যই আকৃষ্ট করিতেছিল। বিমলবাবুর সদাপ্রফুল্ল মুখের কোণে বালসুলভ সরল মৃদু হাসি সর্বদা লাগিয়াই থাকিত। তাঁহার বিপ্লবকার্যের নিপুণতার খবর জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই; কিন্তু আমরা ইহা জানি যে নিজের সহৃদয় ব্যবহারে লোকের চিত্তজয়ে তিনি খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার সস্নেহ আলাপে ও কথার মাধুর্যে প্রমোদরঞ্জন আকৃষ্ট হইতেছিল এবং প্রমোদরঞ্জনের বালকোচিত সরল কথাবার্তাতে বিমলবাবুও মুগ্ধ হইতেছিলেন। রাত্রি হইয়া গিয়াছে দেখিয়া প্রমোদরঞ্জন বাসায় অভিভাবকের তিরস্কার প্রাপ্তির আশঙ্কায় অনেকটা যেন অনিচ্ছায় বিমলবাবুর নিকট হইতে সেদিনের মতো বিদায় চাহিল। বিমলবাবুও তাহাকে তাহার বাসা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেন।

বিমলবাবু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাসায় ফিরিতেছিলেন। তাঁহার স্মৃতির-দ্বারে প্রমোদরঞ্জনের একটি কথা বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘা দিতেছিল, – 'পরকে আপন ভাবিবার মতো গৌরবময় ভুল জীবনে সত্যই আমরা খুব বেশি করিবার সুযোগ পাই না, ' বাস্তবিক এই একটি ছোটো কথাতেই আমরা প্রমোদরঞ্জনের প্রাণখোলা মনখোলা, আপনি আপনভোলা স্বভাবের পরিচয় পাই। একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিতকে নির্বিচারে এমন আপন করিবার মতো হৃদয় এ যুগে খুব কম লোকেরই থাকে। এমন সহজ সরল মন, এমন আপনভোলা হৃদয়, এমন আজন্ম-সঞ্চিত বুকভরা-প্রেমের অপূর্ব সমাবেশ– উত্তরকালে তাহার ছোটোবড়ো প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন প্রাণের সাধনায় আমাদের মতো বুদ্ধিজীবীর স্থান কোথায়? দূর ভবিষ্যতে অকূলে পাড়ি জমাইবার জন্যই অন্ধ-নিয়তি এই দুইটি বিভিন্ন হৃদয়কে এমনি সুদৃঢ়বন্ধনে অভিন্ন করিয়া গাঁথিয়া দিল কিনা কে বলিবে?

জীবন গঠনে বিপ্লব-সঙ্ঘের প্রভাব

'গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই,
আবার তোরা মানুষ হ,'

একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদীর সংস্পর্শে আসিয়াও প্রমোদরঞ্জন প্রায় এক বৎসর যাবৎ বিপ্লববাদের কোনো খবরই জানিত না বা বিমলবাবুর এমন অন্তরঙ্গ হইয়াও তাঁহাকে বিপ্লবপন্থী বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশও পায় নাই। যাঁহারা দুই একদিনের পরিচয়ে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া দলবল বৃদ্ধির জন্য নিজেদের বিপ্লবজ্ঞানের ঝুড়ি শূন্য করেন, সত্য-মিথ্যা নানা আজগুবি গল্পের অবতারণায় তরুণমনে একটি রোমান্স (romance) সৃষ্টি করিয়া অধীর আগ্রহে নির্বিচারে দলের তালিকার দৈর্ঘ বাড়াইয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন, তাঁহারা হয়তো এই ব্যাপারে বলিবেন, 'প্রমোদরঞ্জনের প্রতি একটি নির্মম অবিচার করা হইয়াছে', কিন্তু তখনকার দিনে বিপ্লববাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্নধারায় চলিতেন। তাঁহারা সহজেই আত্মপ্রকাশ করিয়া ধরা দিতেন না; তাঁহারা মনুষ্যত্বের উপরই বিপ্লবের বীজ বপন করিতেন, মনুষ্যত্বের শিক্ষাই ছিল তাঁহাদের মুখ্য কর্ম। গুপ্ত-বিপ্লবসমিতিগুলিকে বাহ্যত এক একটা নৈতিক অনুষ্ঠান বলিয়াই মনে হইত। বিপ্লবকর্মীগণ বিপ্লববাদ প্রচার না করিয়া ধর্ম ও নীতির উপদেশই দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দের উচ্চ আদর্শ ও সহজ সরল নীতির কথাই তাঁহারা প্রচার করিতেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া প্রথম দুই এক বৎসর লোকে তাঁহাদিগকে 'গেরুয়াহীন' সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে করিত। তাঁহাদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, আলাপ-আলোচনা সর্বোপরি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও সর্ববিষয়ে সংযত হইয়া চলিবার প্রবৃত্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাদিগকে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারিত না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো দূর-ভবিষ্যতের বিপ্লব-কল্পনা তাঁহাদের প্রাণের পরতে পরতে নিভৃতেই বহিয়া চলিত। সর্ববিষয়ে কঠোর সংযমে অভ্যস্ত ছিলেন বলিয়া একান্ত আপনারজন ছাড়া সহজেই কেহ তাঁহাদের মনের কোণের এই গোপন চাওয়াটির সন্ধান পাইত না।

জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁহাদের যেমন তীব্র আগ্রহ ছিল শারীরিক উন্নতিবিধানোপযোগী বিবিধ ব্যায়ামচর্চায়ও তাঁহাদের অফুরন্ত উৎসাহ ছিল। কেহ বিপ্লববাদীর সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে অনেকগুলি নৈতিক পরীক্ষার ভিতর দিয়াই দলে আসিতে হইত। ব্রহ্মচর্য পালন, সদগ্রন্থ পাঠ, সৎচিন্তা,

সৎসঙ্গ ইত্যাদি আত্মোন্নতির বিবিধ উপায় অবলম্বনে ও রোগীর সেবা, আর্তের দুঃখমোচনের চেষ্টা ইত্যাদি যাবতীয় জনহিতকর কার্যের ভিতর দিয়াই কিভাবে সে শনৈঃ শনৈঃ একটা শক্ত মানুষ হইয়া উঠিতেছে তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিত না। আমাদের প্রমোদরঞ্জনও এসব পরীক্ষার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে বিপ্লবপথে পা বাড়াইতেছিল।

প্রমোদরঞ্জন পড়াশুনায় কোনোদিনই খুব ভালো ছেলে ছিল না। অভিভাবকের রুদ্রচক্ষুর অন্তরালে বালকোচিত চঞ্চলতায় অনেক সময় লেখাপড়ায় অবহেলা করিত। কিন্তু বিমলবাবুর সস্নেহ-শাসনে পড়াশুনার প্রতি তাহার মনোযোগ অনেকাংশে বাড়িয়া গিয়াছিল। খেলাধুলার দিকে প্রমোদরঞ্জনের একটি বিশেষরকম ঝোঁক ছিল। ফুটবল খেলায় সমবয়সী ছাত্রসমাজে তাহার একটা বিশেষ স্থানও ছিল। হাডুডু খেলায়ও সে একপ্রকার অপরাজেয় ছিল। আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সে এমনি সুনিপুন ছিল যে তাহার বিপক্ষদল রীতিমতো ত্রস্ত হইয়া পড়িত। বিপুল দেহভার লইয়াও সন্তরণে সে অপূর্ব পটুতা ও পারদর্শিতার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিত। মোটের উপর প্রায় সর্বপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকেই সে তাহার সঙ্গীগণের অগ্রণী ছিল। কিন্তু বিমলবাবুর সঙ্গলাভের পর সে তাহার খেলাধূলা ইত্যাদি প্রত্যেক কিছুতেই একটা সংযমের সীমারেখা টানিয়া দিয়াছিল।

সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত এমন সহজ-সরল প্রাণটি ধীরে ধীরে স্বেচ্ছায় দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া কি ভাবে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল এখানে তাহারই খানিকটা আলোচনা করা দরকার। বিমলবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে প্রমোদরঞ্জন স্কুলের পাঠ্যবই ছাড়া আর কোনও বই-ই বড় একটা পড়িত না। কিন্তু বিমলবাবুর উপদেশে সে এখন হইতে দুই একখানি নীতি ও ধর্মোপদেশমূলক পুস্তক পাঠ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একখানা ভালো ভালো গল্পের বইও সে পড়িত পাইত। স্বামী বিবেকানন্দের প্রায় সমস্ত বই-ই সে পড়িয়া ফেলে, দুর্বোধ্য অংশ বিমলবাবুর কাছে গিয়াই বুঝিয়া আসে। এ সময় হইতে সে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করে। তখন সে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে উঠিয়াছে। পড়াশুনায় ভালো ছিল না বলিয়া তাহাকে বাধ্য হইয়াই একটু পড়িতে হইত। বাসায় অভিভাবকের তাড়না, আবার এদিকে বিমলবাবুও নির্মমভাবে বলিয়াছেন ভালোভাবে পাস করিতে না পারিলে তিনিও সম্পর্ক ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কাজেই এ সময় প্রমোদকে অধিকরাত্রি জাগিয়া পড়াশুনা করিতে হইত। এদিকে আবার ভোরের পাখি শিস দিয়া উঠিতেই সে বিছানা ছাড়িয়া বিমলবাবুর কাছে ছুটিয়া আসিত। কোনোদিন তাঁহার বিছানায় শুইয়া শুইয়া গতরাত্রে কি পড়িয়াছে তাহার আলোচনা করিত।

কোনোদিন বা আলোচনা করিতে করিতে উভয়েই প্রাতর্ভ্রমণে বা পুস্পাহরণে বহির্গত হইত। এ সময় সে একটু ধীর, স্থির ও ধর্মভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার মনে নানা রাজনৈতিক প্রশ্নও উদিত হইত। এদিকে তখন সে দুই একখানি রাজনৈতিক পুস্তকও পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে পরস্পরবিরোধী বিভিন্নমুখী চিন্তায় তাহার প্রাণ মন ভরিয়া উঠিত। কখনও বা ভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পন করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, আবার কখনও বা ভাবে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করিয়া একটা মানুষের মতো মানুষ হইবে।

বিমলবাবু তাহাকে দেশের দুঃখকাহিনীপূর্ণ কয়েকখানা রাজনৈতিক পুস্তক পাঠ করিতে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন সমৃদ্ধ অবস্থা ও বর্তমান শোচনীয় অবস্থার সম্বন্ধে একটু একটু আলোচনাও করেন। পুস্তকলব্ধ জ্ঞানে ও বিমলবাবুর সহিত আলোচনায় হৃদয়বান প্রমোদরঞ্জনের কোমল হৃদয়টি ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। তাহার জ্ঞানস্পৃহা এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে সে তাহার জলপানির পয়সা জমাইয়াও ২/১ খানি করিয়া বই কিনিতে আরম্ভ করে। সময় বুঝিয়া বিমলবাবুও তাহাকে ২/১ খানি করিয়া বিপ্লবমুলক পুস্তক পাঠ করিতে দিতেন কিন্তু মুখে বিপ্লববাদ প্রচার করিতেন না। কয়েকখানি বিপ্লবমূলক পুস্তক পাঠ করিয়াই প্রমোদরঞ্জন দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ও তল্লাভে রাষ্ট্র-বিপ্লবের উপযোগিতা বুঝিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু যখনই এসব প্রস্তাব লইয়া বিমলবাবুর কাছে আসিত তখনই হতাশ হইয়া যাইত। বিমলবাবু স্বদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও তাহার কাছে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা মোটেই স্বীকার করিতেন না। বলাবাহুল্য বিপ্লববাদ সম্বন্ধে প্রমোদরঞ্জনের জ্ঞান ও যুক্তি বাড়াইবার জন্যই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন বিশিষ্ট বিপ্লববাদীর বিরুদ্ধ বিপ্লব-মত খণ্ডন করিবার মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুযুক্তিপূর্ণ তর্কের ক্ষমতা প্রমোদরঞ্জনের তখনও হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে তর্কে হারিয়া গেলেও তাহার মন কিন্তু বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে কিছুতেই সায় দিত না। এইরূপে অধ্যয়ন ও ভাবসম্পদ আহরণ করিতে করিতে আমাদের প্রমোদরঞ্জন ধীরে ধীরে শক্ত মানুষ হইয়া উঠিতেছিল।

ভাবুকতা

'সবুজ প্রাণে অধীনতা হানছে বড়ো ব্যথা,
উঠল জ্বলে তরুণ বুকে মুক্তি-জয়ের কথা।'

প্রমোদরঞ্জনের চিন্তা, কল্পনা আজকাল আর পাঠ্যপুস্তকে বা খেলার মাঠে সীমাবদ্ধ নহে। পূত স্বদেশ- প্রেমের বিপুল বন্যা তাহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ের দুকূল ছাপিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার কঠোর নিগড় হইতে মুক্ত করিবার কল্পনায় তাহার প্রাণ-মন ভরিয়া গিয়াছে। পরাধীনতার গ্লানি যে জগদ্দল পাথরের মতো সমস্ত দেশটির বুক জুড়িয়া চাপিয়া বসিয়া আছে তাহার প্রাণে, এই সত্যটুকু আজ বেশ স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াছে। সে কখনও বা ভাবে ভারতের ভবিষ্যৎ শিবাজি কোন গিরিগহ্বরে বসিয়া এখন সঙ্গোপনে শক্তিসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত, কখনও বা ভাবে প্রতিষ্ঠা আজ বিসর্জনের হিম-বুকে বাসা বাঁধিয়াছে- তাই বলিয়া কি আনন্দমঠের 'সত্যানন্দ' আর ফিরিবে না? মহাপুরুষ সংশ্রবে 'সত্যানন্দ' হয়তো আবার দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, অপরাজেয় শক্তি লইয়া 'হরে মুরারে' ধ্বনিতে বাংলা মায়ের কানন প্রান্তর মুখরিত করিবে।

এসময় সে সরকারি রিপোর্টে (Rowlatt committee Report) প্রকাশিত সত্য-মিথ্যা বিজড়িত বিপ্লববাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করে। সরকারি রিপোর্টে বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য থাকিলেও এবং বিপ্লববাদীগণের নাম অকথ্য বিশেষণে কলঙ্কিত হইলেও প্রমোদরঞ্জনের হৃদয় কিন্তু বিপ্লববাদীদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিত। সে বিপ্লবকর্মীদের অসাধারণ, অতি মানুষই মনে করিতে লাগিল। যাহারা 'চারিদিক হতে অমর জীবন বিন্দু বিন্দু করি আহরণ' এত বড়ো একটা শক্তির খেলা দেখাইয়াছে তাহাদিগকে নেহাত নগণ্য মনে করিয়া উড়াইয়া দিবার ধৃষ্টতা সে যুগে হয়তো খুব বেশি লোকের ছিল না। এই অবস্থায় প্রমোদরঞ্জনের মতো একজন হৃদয়বান ভাবপ্রবণ যুবক যদি গোপনে কোনোদিন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া থাকে তাহাতে কাহারও আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনো হেতু নাই।

যাঁহারা নানারূপে নিগৃহীত হইয়া তখনকার 'ভারত রক্ষা আইন' অনুসারে (Defence of India Act) সরকারের কারাগারে বা অন্তরিনে আবদ্ধ থাকিয়া নিজের অদৃষ্ট গণনা করিতেছিলেন এ সময়ে প্রমোদরঞ্জনের দৃষ্টি তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইল। একদিন তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিমলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেই

তিনি চোখের জলে তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন- ‘তারা সবে গেছে, আবার আসিবে ফিরে’, তাঁহার এই ব্যথাভরা সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রমোদরঞ্জনের ফুল্ল নয়নযুগল হইতেও কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া ধরণীতল সিক্ত করিল। বিমলবাবুর বুকের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা এতদিন আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করিতেছিল তাহা আজ এই প্রথম তাঁহার চোখের জলে ধরা পড়িল। তাঁহাদের দেবোপম চরিত্র, অপূর্ব আত্মত্যাগ, অসীম কর্মনিষ্ঠার কথা প্রমোদরঞ্জন কতদিন শুনিয়াছে, কিন্তু আজ এই প্রথম সে চোখের জলে তাঁহাদের স্মৃতির তর্পণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিল। ভবিষ্যৎ ভারতের দধীচীর এই অশ্রুতর্পণ একেবারে ব্যর্থ হইয়াছে কি?

এই ঘটনাটি শুনিয়া অনেকে হয়তো প্রমোদরঞ্জনকে কেবল একজন ভাবপ্রবণ যুবক বলিয়াই মনে করিবেন, আমরাও তাহাকে তাহাই মনে করি। কিন্তু ইহা একেবারে অসাধারণ- অন্তরের অন্তঃস্থল হইতেই এই ভাবুকতা উছলিয়া উঠিয়াছিল। ইহা যে একটা সাময়িক উত্তেজনা নয় তাহার ভবিষ্যৎ জীবনই তাহার সাক্ষী। তাহার উত্তরকালের কৃতকর্মের ভালমন্দ সমালোচনা আমরা এখানে করিব না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা বলিব, যে এতটুকু হৃদয়বত্তা, দেশের ও দেশসেবকের প্রতি এতটুকু মমত্বজ্ঞান ছিল বলিয়াই এই অজ্ঞাতনামা যুবকের জীবন-কথা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার প্রাণের এই বিশেষত্বটুকু না থাকিলে আমরা তাহাকে ভুলিতাম সেদিনই– ‘অনন্ত নিদ্রার কোলে যে দিন পড়িল ঢলে,/মৃত্তিকার সমাধি শয়নে।’

বিদ্যালয় বর্জন

'যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা।'

যাহারা একদিন তেত্রিশ কোটি নরনারীর মুক্তি-সাধনায় কোনোপ্রকার দুঃখকে, সংগ্রামকে ভয় করে নাই বরং স্বেচ্ছায় দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া দুঃখের গর্বে স্ফীত হইত, নির্যাতনে প্রলোভনে যাহাদের তখনও পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, যাহাদের নিশ্বাসে বিষের কল্পনা করিয়া সুশাসন ও শান্তি-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া সামরিক শক্তিতে শক্তিমান বিদেশি সরকার তাহাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকুও হরণ করিয়া (ভারতরক্ষা আইনানুসারে) কারাগারে বা অন্তরিনে নির্বাসিত করিয়াছিল দেশবাসী তাহাদিগকে ভুলে নাই– ভুলিতে পারে নাই। সরকারের করুণার অভিনয়ে তাঁহারা প্রায় সকলেই কারাগার বা অন্তরিনে হইতে ঘরে ফিরিয়াছেন- তাঁহাদের এই মুক্তিলাভের অনেক হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। আমাদের প্রমোদরঞ্জন উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও এবার বড়ো আশায় বুক বাঁধিল।

প্রমোদরঞ্জন তাহার স্বভাবসুলভ ভাবপ্রবণতায় প্রত্যাগত স্থানীয় রাজবন্দিদের অনেকের কাছেই অতি সন্তর্পণে উপস্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু যতটুকু আশা লইয়া সে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাকে অনেক ক্ষেত্রে ততটুকু নিরাশা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল– 'উচল বলিয়া অচলে চড়িল পড়িল অগাধ জলে'। কেবল শিবুদার কাছে গিয়াই তাহার অশান্ত প্রাণ একটু শান্ত হইল– তাহার শ্রান্ত-ক্লান্ত বুকে আশার বাণী ধ্বনিয়া উঠিল। কিন্তু এই তরুণ বিপ্লবকর্মীদের সবচাইতে আশ্চর্য লাগিল যে, যাহারা একদিন নিঃশেষে আপনাকে এমনি বিলাইয়া দিয়াছিল আজ তাহারা কি করিয়া ধীরে ধীরে আপনাকে কুড়াইয়া লইয়া এমন সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার জাঁকিয়া বসিল? এমন আপনভোলা দুর্দান্ত হৃদয়গুলি কি করিয়াই বা এমন আত্মপ্রিয় শান্ত হইয়া উঠিল? যাহাদিগকে তাহারা প্রাণের দোসর মনে করিয়া কত যত্নে, কত ত্যাগের দৃষ্টান্তে একদিন বুকে টানিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহাদেরই প্রতি এই হৃদয়হীন ঔদাসীন্য। এই সংসারানভিজ্ঞ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা কি করিয়া আবার এমন নিপুণতার সহিত সংসার পাতিয়া বসিল ইহা দেখিয়া একদিন অনেকেই নীরবে চোখ মুছিয়াছিল।

মোটের উপর এক্ষেত্রে অনেক অসম্ভবই অনেকের বেলায় সহজ সম্ভব হইয়া উঠিলেও এক শিবুদার বেলাতেই তখনও পর্যন্ত তাঁহার গত জীবনের অনেক অসম্ভব ব্যাপার অপরিবর্তনীয়রূপে অসম্ভবই রহিয়া গেল। এক শিবুদার দিকে চাহিয়াই প্রমোদরঞ্জন ও তাহার সহকর্মীরা ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিল। বুক-ভরা প্রেম, হৃদয়-ভরা উৎসাহ, অপরিসীম জ্ঞান, নেতৃসুলভ কর্মশক্তি ও অভিজ্ঞতা লইয়াই তিনি এই তরুণ বিপ্লব সঙেঘর শুভ-সাধক হইয়া রহিলেন। এমন সর্বজনপ্রিয় হৃদয়বান উৎসাহী কর্মীর সংস্পর্শে প্রমোদরঞ্জন নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতে লাগিল।

এই সময়ে কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। চট্টগ্রামের তরুণেরাই প্রথমে বন্ধনহীন ঝরাপাতার মতো প্রথম আলোড়নেই ছুটিতে থাকে। এখানেও শিবুদাকে আমরা সকলেই পুরোভাগে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কারন এই তো সেদিন অন্ধকারার নির্মম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরের আলোবাতাসের সঙ্গে সবেমাত্র পরিচিত হইতেছিলেন; আবার ইহারই মধ্যে কেমন করিয়া সেই বন্ধনের জন্যই নিজেকে প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন!

এসময় দেশপূজা নেতৃগণ, যুবকগণকে স্কুল কলেজ বর্জন করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে (Passive Resistance) সরকারের এই দেড়শত বৎসরের সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন শৃঙ্খলাকে বিকল বা অচল করিবার কার্যকারিতা সর্বপ্রথমে ছাত্রসমাজের কপাল ঠুকিয়া পরীক্ষিত হইতে চলিল। বিদেশীয় সরকারের শাসন-শৃঙ্খলার উপর বহুযুগ সঞ্চিত বিতৃষ্ণা আজ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাইল। বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ এ সময় রীতিমতো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। স্কুল কলেজগুলি ভাঙে-ভাঙে ভাঙে না–সকলেই কংগ্রেসের পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশনের ফলাফলের দিকে চাহিয়া আশু উত্তেজনার বেগ সামলাইয়া লইল। কিন্তু আমাদের প্রমোদরঞ্জন কলিকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পরেই মা সরস্বতীর উপর বেশ একটি স্থায়ীরকম নোটিশ জারি করিয়া চট্টগ্রামের ছাত্রসমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিল। বলাবাহুল্য আমাদের প্রমোদরঞ্জনই চট্টগ্রামের প্রথম অসহযোগী ছাত্র।

এই ব্যাপারে তাহার আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই বিশেষরকম ক্ষুব্ধ হইল। তাহার এই আকস্মিক দুর্বুদ্ধির হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ডের ও অত্যাচারের বিস্তৃত ইতিহাসটি

পাঠ করিলে এ যুগে কেহই বেশিদিন নির্বিকার থাকিয়া সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিবে না ।

এই এতটুকু কথাতেই আমরা তাহার প্রাণের গভীর বেদনার খবর পাইয়াছিলাম। প্রমোদরঞ্জন বরাবরই সংযত স্বল্পভাষী ছিল। হৃদয়টি এমনই উন্মুক্ত ছিল বলিয়াই সর্বদাই তাহার মুখ বন্ধ হইয়া থাকিত। অনেককথা মুখের ভাষায় প্রকাশ না করিয়া নিজের জীবনে তাহা প্রকাশ করাই তার স্বভাব ও লক্ষ্য ছিল। জীবনের ছোটখাটো কোনো ব্যাপারেই ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে,–

'আমি পূজারি বীর!
সংযতভাষী নবীন তাপস
ডালি দিল নিজ শির।
ঘুচাতে মায়ের দুঃখ বেদনা
শৃঙ্খল জননীর
মায়ের চরণে লুটিল তাহার
ভক্তি-প্রণত শির।।'

স্বেচ্ছা-সেবকের কার্য

‘কর্মযোগের পাঠশালাতে
ছাত্র আমি শিক্ষা লব।
তন্দ্রাহরণ মধ্যদিনের
মন্ত্রে এবার দীক্ষা লব।’

বিপ্লববাদীগণের এত অন্তরঙ্গ হইয়া এবং মনেপ্রাণে তাঁহাদের কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিয়াও প্রমোদরঞ্জন কেন অসহযোগ আন্দোলনে প্রথমেই গা ভাসাইয়া দিল অনেকেই তাহার কারন নির্ণয় করিতে পারে নাই। তখনকার দিনে যাহারা বিপ্লববাদীদের ২/১ বৎসরের সাহচর্যমাত্র পাইয়াছে তাহারা তাঁহাদের কাছে শুধু স্বদেশ- প্রেমিকতার আদর্শ পাইত। বড়োজোর স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাটুকুমাত্র বুঝিত। আমাদের প্রমোদরঞ্জনও এইটুকু মাত্রই বুঝিয়াছিল। স্থানীয় বিপ্লব-সঙেঘর অভ্যন্তরীণ অবস্থার কোনো খবরই সে রাখিত না। ভাবপ্রচার ব্যতীত তখনকার বিপ্লববাদীদের অন্য কোনো চিত্তাকর্ষক আয়োজন বা অনুষ্ঠান ছিল না বলিলেই হয়। যে সব মাল-মশলায় সবুজ প্রাণে রোমান্সের গোলাপি নেশা সৃষ্টি করে তখনকারদিনে বিপ্লববাদীদের হয়তো তাহা ছিলও না– কিংবা এখানে সেখানে এক আধটুকু সম্বল যাহা ছিলওবা তাহা হয়তো তখন পাতালপুরীতে বাসা বাঁধিয়াছে। বিপ্লববাদীদের কথায় বা কাজে অদূর ভবিষ্যতের কোনো বিপ্লব আয়োজনের সন্ধান পাওয়া যাইত না।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বিশিষ্ট কর্মীগণ ফিরিয়া আসিয়া যে পন্থা অবলম্বন করিলেন তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রমোদরঞ্জন হয়তো একটু হতাশও হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবের মূলনীতির বা আদর্শের উপর তাহার শ্রদ্ধা অবিকৃত রহিয়া গেল। ‘বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, একা আমি পড়ে রব মুক্তি-সমাধিতে’- এতটুকু নিষ্ঠা, হৃদয়ের বল, আত্মবিশ্বাস এবং কার্যক্ষমতা খুব বেশি লোকের থাকিতে পারে না। আমাদের প্রমোদরঞ্জনেরও হয়তো তাহা ছিল না; এবং এটুকু ছিল না বলিয়াই হোক বা সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়াই হোক এই নবীন পূজারি তাহার প্রাণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ভিন্নগতিতে মায়ের পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

বিমলবাবু প্রমুখাৎ অন্যান্য বিপ্লব কর্মীগণও কিছুদিন পরে অসহযোগের আসরে নামিয়া স্থানীয় আন্দোলনকে জমকাইয়া তুলিলেন। অহিংসার উপর তাঁহাদের কতটুকু আস্থা ছিল তাহা আমরা জানি না; কিন্তু অসহযোগের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস ও আস্থা বরাবরই ছিল। অহিংস অসহযোগে দেশের রাজনৈতিক মুক্তিলাভ হইবে এই বিশ্বাস তাঁহাদের গোড়া হইতেই ছিল না। তবে ইহাতে যে দেশ মুক্তির পথে অগ্রসর হইবে এবং অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণেরও যে একটি রাজনৈতিক শিক্ষালাভ হইবে ইহাই তাঁহারা পরমলাভ মনে করিলেন এবং নিষ্ঠা ও প্রাণপণ অধ্যবসায়সহকারে কংগ্রেসের বিধিনিষেধ মানিয়া কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু আমাদের প্রমোদরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস লইয়াই একেবারে মনেপ্রাণে আদর্শ অসহযোগী হইয়া রহিল। তাহার জ্ঞান ও কল্পনা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই হোক বা তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তির অভাববশতই হোক সে মহাত্মা গান্ধির নির্দেশিত– এক বৎসরের মধ্যেই স্বরাজপ্রাপ্তির কল্পনা করিয়া বসিয়াছিল। সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকের দলে ভর্তি হইয়া নিজের সমস্ত আভিজাত্য ভুলিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে শহরের অলিতে-গলিতে মুষ্টি-ভিক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সুখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াও অহোরাত্র এমন হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সে বেশ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত প্রমোদরঞ্জনকে আমরা আরও দুইবার স্বেচ্ছাসেবকের কার্যে বিশেষভাবে দেখিয়াছি। সেবার বার্মা অয়েল-কোম্পানির শ্রমিকধর্মঘটের পরিচালনভার যখন চট্টগ্রামের অসহযোগীগণ গ্রহণ করিলেন সে-সময় স্বেচ্ছাসেবকগণের কি উৎসাহ! যে সমস্ত অনন্যকর্মা স্বেচ্ছাসেবকগণের আপ্রাণ চেষ্টায় উদ্ধত সাহেবকোম্পানিও আখেরে মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছিল আমাদের প্রমোদরঞ্জন সেই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর একজন ছিল। তাহাদের নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতার কথা আর কি বলিব? খাওয়াদাওয়া ভুলিয়া দিবারাত্র নেতৃগণের নির্দেশিত স্থানে তাহারা সৈনিকের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াইয়া পাহারা দিয়াছে। নদীর জলে সাঁতার কাটিয়া এক একজনকে সাত-আট ঘন্টা পর্যন্ত পাহারা দিতে হইয়াছে। নিশ্চিত বিপদের সম্ভাবনা জানিয়াও রেলের লাইনের উপর মাথা রাখিয়া দিবারাত্র ‘পিকেটিং’ করিয়াছে। এসব কার্যে তাহাকে কোনোদিন হতাশ বা হয়রান হইতে দেখি নাই। তাহার এইরূপ অবিচলিত দৃঢ়তা ও কঠোর সংযম দেখিলে মনে হইত ‘চলা যেন বাঁধা আছে, অচল শিকলে।’ এ সময় সে কাজে এমনি বিভোর হইয়া গিয়াছিল যে ৩/৪ দিন

বাসায় খাইতেও আসে নাই। চিড়া, মুড়ি সেখানে দৈবাৎ যাহা জুটিয়াছে তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া বাসায় আসিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। ভাবের মুখে, উত্তেজনার মুখে কিরূপে এমনই করিয়া ৩/৪ দিন কাটিয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই। জাতীয় সৈনিকগণের দৃঢ়তা এবং কার্যক্ষমতা এতদূর নিখুঁত ও প্রশংসনীয় ছিল বলিয়া চট্টগ্রাম, অসহযোগ আন্দোলনে বাংলাদেশের আদর্শস্থল হইয়া উঠিয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলন যখন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে সে সময় মহাত্মা গান্ধি প্রথমবার চট্টগ্রামের পদার্পন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে বিশেষভাবে তাঁহারই কাজের জন্য চট্ট্রগ্রামের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মধ্য হইতে মাত্র অষ্টাদশজন সেবক লইয়া আদর্শ কর্মী শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে Reserve Volunteer Corpse নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠিত হয়। আমাদের প্রমোদরঞ্জনও তাহাদের মধ্যে অন্যতম। স্টেশন হইতে মোট বহন করিয়া আনয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মার খাওয়া, পরা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের পর্যবেক্ষণ অবধি সমস্ত এই বিশেষ বাহিনীর উপরই অর্পিত ছিল। মহাত্মার বিশ্রামাগারের ফটকে সৈনিকের মতো ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াইয়া মহাত্মার দর্শনপ্রার্থীর অজস্র জনস্রোতকে সংযত করিয়া রাখিবার দায়িত্ব তাহাদেরই। এ সময় তাহারা যে কৃতিত্ব, যে সংযম ও বিনয়পূর্ণ দৃঢ়তা দেখাইয়াছে আজিও চট্টগ্রামবাসী তাহা ভুলে নাই। এই আদর্শ সেবকবাহিনীর একটি ফটোগ্রাফ কংগ্রেস আফিসে ও স্থানীয় কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এই বিশেষবাহিনীর বিশিষ্টতাটুকু স্থানীয় পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ফলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।

চট্টগ্রামের অসহযোগ আন্দোলন স্থানীয় যুবকগণের আপ্রাণ চেষ্টায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যুবকেরা অনেকেই স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যথেষ্ট সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এমন আপনভোলা হইয়া নীরবে নিঃশেষে নিজেকে বিলাইয়া দিতে প্রমোদরঞ্জনের মতো আর কাহাকেও বড়ো একটি দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্বেচ্ছাসেবকের অনেকেই পরিশ্রমে কাতর হইয়া বিশ্রাম চাহিত, কিন্তু বিশ্রামের কথা দূরে থাক সে বরং নতুন পরিশ্রম করিবার সুযোগ খুঁজিত। বিশ্রামের কথা বলিলেই সে হাসিতে হাসিতে বলিত, ‘কর্মজীবনে কর্ম সমাপ্তিই একমাত্র অবসর।’ অবিশ্রান্ত খাটিয়া খাটিয়া আখেরে রোগশয্যায় বিশ্রাম লাভ ছাড়া তাহার কর্মজীবনে কোনোদিন অবসর আসিয়াছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না।

বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন

'তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

তোর আশালতা পড়বে ছিড়ে

হয়তো রে ফল ফলবে না।'

আগেই বলিয়াছি প্রমোদরঞ্জন অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি রীতিমতো শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এমন শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিল যাহাতে আখেরে তাহাকে ততোধিক অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। নিঃস্ব দেশবাসীর শ্রদ্ধা-প্রদত্ত দুঃখের দান এক শ্রেণীর হৃদয়বান নেতারা, কর্মীরা মাথায় বহিয়া আনিয়াছেন, অন্য শ্রেণীর কর্মীরা তাহার মর্যাদা রক্ষা করে নাই। একদিকে অনেক হৃদয়বান নেতা, কর্মী নিজেদের উন্নতির পথ, সুখ-সুবিধা আশা-আকাঙ্খার উপায়—এক কথায় বলিতে গেলে সমস্ত অবলম্বন স্বেচ্ছায় পায়ে দলিয়া দুঃখকে, অভাবকে বরণ করিয়াছেন। অন্যদিকে কত ঘুটে-কুড়ানির ছেলে চন্দন বিলাসী হইয়া মোটর হাঁকাইয়াছে। যে ছাত্রসমাজ হইতে প্রমোদরঞ্জনের মতো হৃদয়বান যুবকের অভ্যুদয় হইয়াছিল সে ছাত্রসমাজের অবস্থা আরও শোচনীয়। একদিন যাহারা ভাবের মুখে 'গোলামখানার গোলামী শিক্ষা চাই না চাই না চাই না হে' বলিয়া সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি অশ্রদ্ধার গানে দেশবাসীর ও ছাত্রসমাজের প্রাণে চমক লাগাইয়া দিয়া অসহযোগের আসরে নামিয়া পড়িয়াছিল ঠিক তাহারা অবস্থার পীড়নে মধ্য অঙ্কে অভিনয় শেষ করিয়া ততোধিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ লইয়াই আবার সরকারি গোলামখানার ছায়াতলে আসিয়া পূর্বস্মৃতি ভুলিতে চেষ্টা করিল। মাত্র মুষ্টিমেয় যুবক অভাবকে, পীড়নকে, তাড়নকে, বরণ করিয়া লইল। আখেরে তাহাও টিকিল না। যাহা হউক এখানে এসব অপ্রীতিকর কথার আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। মোটের উপর, অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যক অসহযোগী ছাত্রদের মধ্যে যাহারা দেখিয়া, শুনিয়া, ঠেকিয়া, বুঝিয়া অসহযোগের আসর হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল আমাদের প্রমোদরঞ্জন তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইলেও সে দেশের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায় নাই। এ বিফলতায় তার প্রাণে যে ব্যথা রণিয়া উঠিয়াছিল তাহার দুই-চারিজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত আর কেহই জানে না। এসময়ে আবার সে তাহার

পূবর্তন বিপ্লবী-সহচরগণের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে লাগিয়া গেল। সে দেখিল তাহারাও দুঃখে সত্যই ম্রিয়মান হইয়াছিল বটে কিন্তু এই বিফলতায় কেহই হতাশ হইয়া পড়ে নাই। এ সময় অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর সে বুঝিয়া গিয়াছিল যে স্বদেশের স্বাধীনতা তার জীবনের লক্ষ্য–সহযোগ, অসহযোগ, বিপ্লব ইত্যাদি এক একটা পন্থা মাত্র। লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আজীবন কোনো পন্থার বা নীতির দাস হইয়া এই পন্থা বা নীতিকেই লক্ষ্য বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। দেশ, কাল ও অবস্থা বুঝিয়া অবশ্য একটা পন্থা অবলম্বন করিয়া নিষ্ঠা ও ধৈর্য সহকারে লক্ষ্যের দিকে নিরলস জীবন লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এ সময় হইতে সে অহিংস অসহযোগের ঋজুপথে না চলিয়া অন্য পন্থা অবলম্বনের কল্পনা করিতে লাগিল। অসহযোগ নীতির দিক হইতে যতই সুন্দর হউক না কেন কার্যক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে তাহার মনে সংশয় আসিয়াছিল। নীতিবাদীর কাছেই নীতির মূল্য আছে। কিন্তু এই ‘যার লাঠি তার মাটি’-র যুগে নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া দুর্নীতিপরায়ণের বিবেকশূন্য পাষাণ বুকে প্রেম-বৈরাগ্য উদ্রেকের কল্পনা করা বাতুলতারই নামান্তরমাত্র এই মনে করিয়া সে প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। এ সময় মনেপ্রাণে অহিংস না হইলেও কার্যত অসহযোগী হইয়া থাকাই সে বাঞ্ছনীয় মনে করিল।

তাহার অভিভাবকেরা তাহাকে স্কুলে ফিরিয়া যাইবার জন্য বরাবরই পীড়াপীড়ি করিয়া আসিতেছিলেন। এ সময় তাহার সাথের সাথিরাও তাহাকে স্কুলে ফিরিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। যাহা একবার হেয় বলিয়া বর্জন করিয়াছে তাহাই আবার শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার মন কিছুতেই সায় দিল না। পরাজয়ের লাঞ্ছনায় ও দারুণ লজ্জায় তাহার হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু বিমলবাবুও যখন অবশেষে স্কুলে ফিরিবার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইলেন তখন সে বালকের মতো কাঁদিয়া ফেলিল। বলাবাহুল্য একান্ত অনিচ্ছায় নিতান্ত হতাশ হৃদয়ে বিমলবাবুর অনুরোধে ও সমিতির শৃঙ্খলারক্ষার জন্যই সে স্থানীয় মিউনিসিপাল স্কুলে ভর্তি হইয়া গেল। তাহার অভিভাবক ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা তাহার এই সুমতি দেখিয়া মনে মনে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন।

এই নাতিদীর্ঘ দুই বৎসরের মধ্যে স্কুলের অনেক পরিবর্তন সে দেখিতে পাইল। তাহার পূর্বপরিচিত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই পাশ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। দুই-তিন ক্লাসের নিচে পড়িত বলিয়া যাহারা এক সময় শ্রদ্ধায় দূরে দূরে থাকিত

আজ দৈব বিড়ম্বনায় তাহাদেরই পাশে তাহাকে স্থান করিয়া বসিতে হইয়াছে। উভয়পক্ষেই একটু একটু সঙ্কোচ লাগিতেছিল। এই বলিষ্ঠাবয়ব খদ্দর পরিহিত, স্বদেশি ছাত্রের প্রতি সকলেই একটু মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিত। দুই-চারিদিনের মধ্যে সে তাহার ব্যবহারের মাধুর্যে সরল মধুর কথাবার্তায় সকলের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল। আবার মহাউৎসাহে সে খেলাধূলায় লাগিয়া গেল। এবারকার খেলাধূলার মধ্যে এই একটু বিশেষত্ব ছিল যে, এইসময় বরাবর স্বদেশি ক্রীড়াদির দিকেই তাহার একটা বিশেষ ঝোঁক হইয়াছিল।

তাহার ব্যবহারিক জীবনেও সে নানাভাবে স্বাদেশিকতা বজায় রাখিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে অনেক ছাত্রকে প্রিয়তম বন্ধুরূপে পাইয়া গিয়াছিল। যাহারা এক সময় বিদেশি ‘দিল বাহার’ কাপড় পড়িয়া গর্ব ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিত তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেকে কাপড়ে চোপড়ে স্বদেশি হইয়া গিয়াছিল। কখনও বা মৃদু পরিহাসে কখনও বা জেদ বা অভিমান করিয়া সে তাহার বন্ধুবর্গকে স্বদেশি করিয়া তুলিয়াছিল। এই স্পর্শমণির স্পর্শ পাইয়া অনেকেই মনেপ্রাণে স্বদেশী হইয়া উঠিয়াছিল।

বন্ধুপ্রীতি

'প্রেম শুধু বেঁধে দিতে পারে বিশ্বময়

হৃদয়ে হৃদয়,

মিলনের মহানন্দে কত প্রাণ হয়ে আত্মহারা

সম্পূর্ণ করিয়া তোলে অসম্পূর্ণ জীবনের ধারা।'

সমস্তখানি বুকে দরদ দিয়া যাহারা দেশের দরদ বুঝে তাহারা প্রায় সকলেই সমাজের শ্রীহীন দুঃখ ও মধ্যবিত্তশ্রেণী হইতে আসে। লক্ষ্মীর বরপুত্রের মধ্যে ক্কচিৎ দুই-চারিজন হৃদয়বান ব্যথার ব্যথী দেখা যায়। সম্ভব অসম্ভব নানা প্রকার আরামের মোহ কাটাইয়া যে দুই-চারিজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য যুবক বিপ্লবের রঙিন কল্পনায় বিভোর হইয়া অসম্ভব সম্ভব করিতে বিপ্লব-সঙেঘ যোগদান করিয়াছিল আমাদের প্রমোদরঞ্জন তাহাদের মধ্যে অন্যতম।

এই অশান্ত যুবকটির এই আরামবিহীন দুর্দান্ত জীবনযাপনের খেয়াল কোনো বুদ্ধিজীবীই হয়তো অনুমোদন করিবে না। প্রমোদরঞ্জন ইচ্ছা করিলেই সুখে, স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে, নিশ্চিন্ত আরামে বেশ দশজন ধনী সন্তানের মতো হাসিয়া-খেলিয়া এবং চিকুরে মুখখানিমাত্র দেখিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এই বীর সন্ন্যাসীর চোখে সংকীর্ণ পরিবার অপেক্ষা বিশাল স্বদেশটাই বড় হইয়া ধরা দিয়াছিল। ক্ষণস্থায়ী দৈহিক আরামের উপর কঠোর স্বদেশ-সেবা ব্রতই আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। এই দিল-খোলা চিরমুক্ত পাখিটি এ জীবনে কিছুতেই আর সোনার-খাঁচার বন্ধনকে শ্রেয় বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। 'উড়িবে যে পাখি ওই অনন্ত আকাশে; সোনার পিঞ্জরে তার সোনার শৃঙ্খলে মিটিবে কি করি?'

এই ধনী পরিবারে প্রমোদরঞ্জনই এতদিন একমাত্র অশান্তির কারণ ছিল। এখন সে একপ্রকার স্বেচ্ছায় স্কুলে ভর্তি হইয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে অভিভাবকেরা বেশ সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত আছেন। এ সময় তাহার অভিভাবকেরা তাহার উপর বেশ একটু কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। তাহার অসহযোগী পোশাক পরিচ্ছদ বদলাইবার জন্য তাহাকে মাঝে মাঝে কটুক্তিও করিতেন। প্রমোদ সমস্তই নীরবে বিনা বাক্যব্যয়ে সহিয়া যাইত। তাহার বন্ধুগণের মধ্যেও প্রায়

সকলেই অসহযোগী। খদ্দর ভুষণে ভুষিত বন্ধুগণ মাঝে মাঝে প্রমোদের সঙ্গে তাহার বাসায় দেখা করিতে আসিলে ইহাতেও অভিভাবকেরা মনে মনে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনে মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। কারণ ইহা সকলেই জানিত যে নিজের প্রতি যতটা কটূক্তি অত্যাচার সে বেমালুম হজম করুক না কেন তাহার প্রিয়তম বন্ধুদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। সমস্তপ্রকারের প্রতিকূলতার মধ্যে একমাত্র অনুকূল অবস্থা এই ছিল, যে তাহার বন্ধুরা প্রায় সকলেই লেখাপড়ায় ও চরিত্রমাধুর্যে ছাত্রসমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া থাকিত। এরা স্বদেশি– কেবল এই অপবাদটুকু ব্যতীত তাহাদের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না। তাহার এই সাথের- সাথিদিগকে সে এমনই আপনারজন মনে করিত ও তাহাদের প্রতি এমনই শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল যে সঙঘভুক্ত যে কোনো একটা অপরিচিত লোকের সম্বন্ধেও সে একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করিত।

তাহাদের বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন একত্র হইয়া শহরের উপর একটা মেস করিয়া থাকিত। তাহাদের সাহচর্য লাভের জন্য সেও বাড়ি ছাড়িয়া মেসে থাকিবার সুযোগ খুঁজিত কিন্তু কোনোরকম যুক্তিসঙ্গত অজুহাতের অভাবে তাহার এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। মেসে বন্ধুদের সাহচর্য ব্যতীত আর কোনো প্রলোভন ছিল না।

এখানে মেসজীবনের একটু বিবরণ দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মেস বলিতে কেহ যেন ঠাকুর-চাকরওয়ালা হোস্টেলের কল্পনা না করেন। এই মেসের অধিবাসীরাই ঠাকুর-চাকরের কার্য, এমন কি ধোপা-নাপিতের কার্যও স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া লইত। তাহারা কৌতুকচ্ছলে বলিত, 'দেশে স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হলে আমরাই সর্বপ্রথম ভদ্রসমাজে honesty, activity & dignity of labour প্রচার করিব। এই বলিয়া সকলে হাসিতে হাসিতে সর্বপ্রকার কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করিয়া যাইত। সঙেঘর মধ্যে যাহাদের শহরের উপর নিজের বলিতে কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না অথচ লেখাপড়া ও নানাকার্য উপলক্ষে শহরে থাকিতে হইত তাহারাই সাধারণত এই মেসে বাস করিত। পোশাকে-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে তাহাদের মেসে অভাব মূর্ত হইয়া থাকিত। কিন্তু এই সৃষ্টিছাড়া মানুষগুলি সেসব অভাবের সঙ্গে বেশ একটা আপোস করিয়া চলিতে শিখিয়াছিল।

এই সময়ে এই একটা মেসই এই ছন্নছাড়া যুবকের একমাত্র আশ্রয়স্থল ও শান্তিকুঞ্জ ছিল। ইহাতেই তাহারা একটা সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল। মেসের

অধিবাসীরা প্রায় সকলেই যুবক ছাত্র। এতদ্ব্যতীত দুই একজন বয়স্ক যুবকও মেসে বাস করিতেন। তাহাদের মধ্যে কেহ বা ছাত্র পড়াইয়া, কেহ বা শহরে বাসোপযোগী সামান্য বেতনে চাকরি গ্রহণ করিয়া মেসে থাকিতেন। অর্থোপার্জনের উপযোগী বিদ্যাবুদ্ধি যোগ্যতা যে তাহাদের কম ছিল তাহা নয় বরং অনেকক্ষেত্রে অনেক সুযোগসুবিধা তাহাদিগকে নিজেদের সঙেঘর কার্যের সৌষ্ঠব সম্পাদনের বিনিময়ে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ইহাতে অভাব হয়ত বাড়িয়াই চলিয়াছে। অভাবকে, দুঃখ-কষ্টকে তাঁহারা আদৌ ভ্রক্ষেপ করিতেন না; অনেক সময় অভাবকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা আমোদ উপভোগ করিতেন।

ছাত্রদের মধ্যে প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান এবং অনেকেই বাড়ি হইতে একটা নির্দিষ্ট মাসহারা পাইতেন। অন্য কোনো মেসে বা হোস্টেলে থাকিলে ওই টাকাতেই তাঁহাদের যথেষ্ট হইত এবং বেশ নির্বিবাদে দিন গুজরান যাইত। কিন্তু সঙেঘর প্রয়োজনে এই মেসে থাকিয়া তাহাদিগকে নিত্য-নতুন অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে অনশনে ও অর্ধশনে কতদিন কাটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের এই অভাবের কারণ অনেক। সকলকিছুই প্রকাশ করিয়া লিখিবার সময় এখনও আসে নাই। দুই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিতেছি।

অন্তরঙ্গগণের মধ্যে কেহ অভাবগ্রস্থ বা আশ্রয়হীন হইলে সে সাময়িকভাবে মেসে থাকিয়া নতুন আশ্রয়ের সন্ধান করিত। সঙঘ গঠনে সিদ্ধহস্ত এমন কাহাকেও আবার কোনো বাড়িতে গৃহ-শিক্ষকের কাজ করিয়া স্কুল বা কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে অনেকসময় সেই সংসারের অভিভাবকতায় তাহার স্বাধীন গতিবিধিতে বাধা পড়িয়া কাজের ক্ষতির সম্ভাবনায়ও কেহ মেসে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই নিঃস্ব সঙেঘর বিভিন্ন কেন্দ্র হইতেও সময়ে অসময়ে লোক যাতায়াত করিত; কার্যব্যপদেশে দুই-চারিদিন মেসে অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইত। এই প্রিয়তম অতিথিগুলিকে শত অভাবের মধ্যেও ইহারা কোনোদিন অবহেলা করে নাই। বরং তাহাদের আগমনে ইহারা নুতনভাবে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইত। অতিথিরাও ধীরে ধীরে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া থাকিতে শিখিয়াছিল। শুধু তাহা নয় এই অভাবের সংসারে প্রতি তাহাদের একটা সত্যিকার প্রাণের আকর্ষণও ছিল। কাজেই এই আয়হীন নাতিক্ষুদ্র সংসারটির আর্থিক কষ্ট ক্রমশ বাড়িয়াই চলিল। এমনও হইয়াছে যে দুইজন লোককে তিনখানি কাপড় পরিয়া পাঁচ ছয় মাস কাটাইতে

হইয়াছে। বাহিরের লোকে তাহাদের ভিতরকার এইসব অভাবের সন্ধান না পাইলেও অন্তরঙ্গগণের কাছে তাহা বেশিদিন গোপন ছিল না।

এইসব জানিয়া শুনিয়া এবং স্বচক্ষে দেখিয়াও প্রমোদরঞ্জন মেসে থাকিবার জন্য তীব্র আকাঙ্খা প্রকাশ করিত। তাহার ধারনা ছিল মেসে থাকিয়া সে যদি বাড়ি হইতে বেশি টাকা আনিতে পারে তবে সঙেঘর কতকটা উপকার হয়। কিন্তু শহরের উপর তাহাদের স্থায়ী রকমের বাড়ি থাকায় তাহার এই অভিলাষ কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

মেসের অধিবাসীরা সাধারণত নিরামিশাষী ছিলেন। বলাবাহুল্য ইহা কোনোপ্রকার সাত্ত্বিক সংস্কারে বা ধর্মপ্রেরণা হইতে নহে– অভাবের প্রেরণাই ইহার মূল কারণ। প্রমোদরঞ্জন মাঝে মাঝে ইচ্ছা করিয়া তাহার বন্ধুদের দুঃখের অন্নের আস্বাদ গ্রহণ করিত এবং তাহাদের অভাবের অংশীদার হইয়া তাহার তিক্ততা অনুভব করিবার সুযোগ খুঁজিত। বাড়িতে যাহার স্নানের জলটাও দরকার হইলে ভৃত্যেরা উঠাইয়া দেয় সেই প্রমোদরঞ্জন মেসে আসিয়া বালতি বালতি জল টানে, ঘর ঝাঁট দেয়, রন্ধন করিয়া খাওয়ায়।

এইরূপে সে আজীবন সর্ববিধ আর্থিক ও শারীরিক সাহায্যে তাহার বন্ধুগণের দুঃখের লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। মেসে আসিয়া কাহারও পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রখানা পরিধান করিয়া তৎস্থানে নিজের পরিধেয় নূতন বস্ত্রখানা রাখিয়া চলিয়া যাইত। কখনও বা নিজের পরিস্কার জামাটি খুলিয়া রাখিয়া কোনো বন্ধুর ধূলা-মলিন জামাটি গায়ে দিয়া নিজের বাসায় আসিয়া হাজির হইত। আর এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য নীরবে অভিভাবকের অকারণ কটুক্তি শুনিত।

প্রমোদরঞ্জন তাহার সাথের সাথিদের তাহার অন্তরঙ্গ স্বজনবর্গ হইতেও প্রিয়তম মনে করিত। ইহাদের প্রতি তাহার হৃদয়ের আকর্ষণটুকু একেবারে তাহার ধ্যানচিন্তায়, কাজকর্মে একান্ত স্বাভাবিকরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। এই পাতানো সংসারের পাতানো সম্বন্ধটুকু তাহার কাছে একেবারে প্রাণে প্রানে সত্য ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছিল। এতটুকু ফাঁক–এতটুকু দ্বিধা, সঙ্কোচ তাহার মধ্যে দেখা যায় নাই। ইহাদের বরাবরই ধারণা ছিল যে, ‘প্রাণের গ্রন্থি দৃঢ় না হইলে দুর্দিনে, দুঃসময়ে কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া সঙেঘর সর্বনাশ সাধন করিতে পারে’। এই প্রকারের এক একটি সত্য বিশ্বাসকে নিবিড়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতে প্রমোদরঞ্জন ছিল অদ্বিতীয়। তাহার এই স্বল্পকালস্থায়ী ক্ষুদ্র জীবনে এই অপরিসীম বন্ধুপ্রীতির উদাহরণের অন্ত নাই। এইখানে একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একবার তাহার ভয়ানক রকম জ্বর হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য উপসর্গাদিও দেখা দেয়। আত্মীয়স্বজনেরা তাহার আরোগ্যলাভে সন্দিহান হন। এ সময় সে তাহার গ্রামের বাড়িতে। পূর্বেই বলিয়াছি প্রমোদরঞ্জন সম্পন্ন ধনীসন্তান। এ অবস্থায় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া সে মায়ের কাছে অন্তঃপুরে স্থান লইয়াছে। সাংসারিক সম্পর্কে অনাত্মীয় অথচ জীবনের সাথি এই পরমাত্মীয়গণের জন্য তাহার মন খুবই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কখনো বা ভুল বকিতে গিয়া তাহার দুই-একজন বন্ধুর নামোচ্চারণ করিয়া কাতরে ব্যাকুল হইয়া অসংলগ্ন ভাষায় কত কি বকিতেছে, কখনো বা রোগযন্ত্রণায় কাতর হইয়া ছটফট করিতেছে। এ দুঃসংবাদ তাহার বন্ধুমহলে অবিলম্বে প্রচারিত হইল। বিমলবাবু প্রমুখাৎ দুই একজন অধীর আগ্রহে তাহার গ্রামের বাড়ির দিকে ছুটিল। বাহিরের ঘরে গিয়া তাহার একজন অভিভাবককে তাহাদের আগমনের কারণ জানাইয়া প্রমোদকে একবার দেখিতে চাহিল। তিনি এই অপরিচিত, এই অনাত্মীয় যুবকদ্বয়কে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের সম্মতি জ্ঞাপনের কোনো লক্ষণও দেখাইলেন না। একটু উদাসভাবে বলিলেন, 'সে সুস্থ হলে আপনাদের কথা তাকে বলব'। হৃদয়হীন, সংকীর্ণমনা সংসারী! এই দুইটি হৃদয়ের রুদ্ধ ব্যথায় ঢাকা সুর তোমার প্রাণের তারে ঘা দিল না! কি করিয়াই বা দিবে! নিতান্ত অনাত্মীয়ও যে সত্যসত্যই পরমাত্মীয় হইতে পারে তোমার সংস্কারের মধ্যে যে তাহা নাই। নিকটে সংসারানভিজ্ঞ একটা অল্পবয়স্ক বালক দাঁড়াইয়াছিল। তার হৃদয় হয়ত ইহাদের কাতর দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল। সে ছুটিয়া বাড়ির ভিতর গিয়া হাঁকিয়া বলিল, 'শহর থেকে দু'জন বাবু দেখতে এসেছে, এঁদের ভেতরে আসতে দেবে না কি?' এই সংবাদ শুনিবামাত্রই রোগ-কাতর মুমূর্ষুর মুখে চোখে একটা হর্ষের রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে মুহূর্তে লম্ফ দিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া তড়িৎবেগে উন্মত্তের ন্যায় টলিতে টলিতে বাহিরের বৈঠকখানায় আসিয়া তাহার বন্ধুদের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। বিস্মিত শুশ্রূষাকারীগণের কোনো বাধাই সে মানিল না। তাহার এই উন্মত্ততা দেখিয়া কেহ বা কাঁদিয়া উঠিল, কেহ বা চিৎকার করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ দুর্বল শরীরে এতটুকু পরিশ্রম ও উত্তেজনা সহ্য হইল না। সে মূর্ছিত হইয়া বন্ধুদের কোলের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিলে সে বন্ধুদের গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং কাতরদৃষ্টিতে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তখন তাহার ও তাহার বন্ধুদ্বয়ের চোখের জলে বাণ ডাকিয়াছে। বিমলবাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রমোদরঞ্জন অর্ধস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, 'দাদা, আপনারা আমায় দেখতে এসেছেন এ যদি স্বপ্ন না হয় তাহলে আমার রোগযন্ত্রণা আজ অর্ধেকটা প্রশমিত হবে। আমার জন্য আপনারা এতই

কি ব্যাকুল হয়েছেন? সবাইকে আমার প্রাণভরা ভালোবাসা জানিয়ে বলবেন আমি তাদের ভুলিনি। আমি খুব শীঘ্র তাদের কাছে ফিরব। আপনাদের না দেখে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে,...' বলিতে বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার মুর্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ বাড়ির লোকেরা উঠাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। বন্ধুরা চোখ মুছিতে মুছিতে শহরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এমন মুমুর্ষূ অবস্থায়ও প্রিয়তম সাথের সাথিগণের প্রতি তীব্র আকর্ষন সত্যই বড়ো মধুর। আত্মীয়স্বজনের অক্লান্ত সেবা-শুশ্রুষার মধ্যেও প্রিয় বন্ধুগণের সাহচর্য লাভের জন্য এমন তীব্র ব্যাকুলতা তাহার চোখের জলে ও রুদ্ধকণ্ঠে সেদিন বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই আদর্শ প্রেমিকের অনাবিল প্রেমধারায় যে ভাগ্যাধীন ব্যক্তিরা অভিসিঞ্চিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে আজ তাহারা কি তাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'ফোঁটা চোখের জলে শোকের তর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হইবে!!

জনসেবা

'পরের সেবায় যার পরাণ উছলে,

পরের সুখের তরে নিজ সুখ যে পাসরে

সেই তো মানুষ হায়, এই ধরাতলে!'

প্রমোদরঞ্জনের ক্ষুদ্র জীবনটি পরার্থপরতার একটি জীবন্ত ইতিহাস। ভোগের সহস্র আয়োজন তাহাকে যেন বরাবর ত্যাগের পথেই ঠেলিয়া দিয়াছে। বিদ্যালয়ের দরিদ্রছাত্রদের কাগজ, কলম, বই, খাতা যোগাইয়া সে কতদিন তাহার অভিভাবকদের হস্তে 'লাঞ্চনা' ভোগ করিয়াছে, নিজের জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া দুর্ভিক্ষের চাঁদা দিয়াছে, দুঃখীর দুঃখ মোচন করিয়াছে, নিজের কাপড়, জামা, ছাতা দিয়া অভাবগ্রস্তের অভাব দূর করিয়াছে। আবার ধরা পড়িয়া অভিভাবকের নিকট পুনঃ পুনঃ তিরস্কার লাভ করিয়াছে। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার এক পরার্থপর হৃদয় কিছুতেই আত্মপ্রিয় স্বার্থপর হইল না। এস্থলে তাহার সেবাজীবনের কয়েকটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দিবার চেষ্টা করিব।

এক সময় চট্টগ্রাম সদর হাসপাতালের কলেরা-ওয়ার্ডে একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় একজন ভদ্রযুবক প্রানত্যাগ করে। খবর পাইয়া প্রমোদরঞ্জন ও তাহার কয়েকজন বন্ধু সৎকারের ব্যবস্থা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। সেখানে আরও দুই তিন জন কলেরা রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। তাহারা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে 'জল, জল' বলিয়া কাতরকণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহাদের শীর্ণ মৃত্যু-মলিন মুখের দিকে চাহিয়া প্রমোদরঞ্জন ভাবিল, 'মৃত্যুর সৎকার অপেক্ষা জীবিতের সেবা সহস্রগুনে শ্রেয়।' এই ভাবিয়া সে আর শবানুগমন করিল না। তাহার বন্ধুরাই শব-স্কন্ধে শ্মশানের পথে অগ্রসর হইল। এদিকে প্রমোদরঞ্জন স্বহস্তে রোগীর বিছানা বদলাইয়া তাহাদের সম্ভব অসম্ভব নানা আবদার রক্ষা করিয়া ঔষধ-পথ্যাদি খাওয়াইয়া ঘন্টার পর ঘন্টা পরিচর্যায় লাগিয়া গেল। সেই একই অবস্থায় তাহার একদিন একরাত্রি কাটিয়া গেল। নিজের স্নানাহারের কথাও ভুলিয়া গেল। এদিকে তাহার হঠাৎ অন্তর্ধানে বাড়িতে সকলে বিষম চিন্তিত হইল। এমনটি তো তাহার কোনোদিন হয় না। তাহার বন্ধুরাও তাহার খোঁজ না পাইয়া তার পরদিন একবার হাসপাতালে গিয়া দেখে, কয়েকজন রোগীর শুশ্রূষায় এমনই তন্ময় হইয়া আছে যে ঘরে কাহারা

আসিয়াছে তাহা ফিরিয়াও দেখিল না। অবাক বিস্ময়ে সকলে দেখিল তাহার সেবারত মুখে কেমন একটা করুণ স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বন্ধুরা কাছে আসিতেই তাহার চমক ভাঙিল। বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে সে একবার বাড়ি হইতে ঘুরিয়া আসিতে প্রস্তুত হইয়াছে এমন সময় অসহায় রোগীটি তাহার করুণাপূর্ণ মুখের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আপনি দেবতা, আমাকে রক্ষা করুন। আপনি না থাকলে আমি আর বাঁচব না।' বন্ধুরা তাহাকে সান্তনা দিয়া বলিল, 'তোমার কোনো ভয় নাই, তাহার প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত আমরাই তোমার কাছে থাকব।' প্রমোদরঞ্জন দৃষ্টিতে ও কণ্ঠে স্নেহ মাখাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'তোমার কোনো ভয় নাই ভাই, আমি শীঘ্রই ফিরব।' ভয়ে ভয়ে বাসায় পৌঁছিলেপর চারিদিকের কৌতুহলী প্রশ্নে সে একেবারে বিব্রত হইয়া পড়িল। তাহার মুখে কোনো সদুত্তর যোগাইল না। সে ইহাও জানিত যে প্রকৃত কথা বলিতে গেলে গোলমাল বাড়িবে বই কমিবে না। অথচ সত্যের উপাসক প্রমোদরঞ্জনের রসনা মিথ্যা বলিতেও অভ্যস্ত নহে। বোবার শত্রু নাই এই নীতিবাক্য মনে করিয়াই নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অভিভাবকের কটুক্তি ও প্রহার লাভ করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে আবার নির্বিকারচিত্তে হাসপাতালের অভিমুখে তড়িৎবেগে ছুটিল। তাহাকে আমরা বহুবার এইরূপ আর্তের সেবায় বিভোর হইয়া মায়ের মতো সেবা করিতে দেখিয়াছি। এমন প্রাণঢালা সেবা নিতান্ত আত্মীয়েরাও করিতে পারে কিনা সন্দেহ। বীরত্বের পাশে মাতৃত্বের এমন অপূর্ব সমাবেশ বড়ো একটা দেখা যায় না। তাহার এই সেবারত জীবনের সকল কাহিনীই সে গোপন রাখিতে চেষ্টা করিত এবং কোনোসময় হঠাৎ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সে সাতিশয় ক্ষুন্ন ও লজ্জিত হইত।

সেবার চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের বোর্ডিং-এর সুপারিন্টেন্ডেন্ট মহাশয় ও তাঁহার এক ছেলে সাঙঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ওই বোর্ডিং-এর অধিবাসী জনৈক ছাত্রের মুখে খবর শুনিয়া প্রমোদরঞ্জন স্বেচ্ছায় তথায় ছুটিয়া যায়। প্রায় ১০/১৫ দিন যাবৎ রোগীরা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ছিলেন। তাহাদের জীবনের আশাও নাকি ছিল না। এই সময় প্রমোদরঞ্জন অহোরাত্র তাহাদের সেবা করে। দিনেরবেলা অভিভাবকের রক্তচক্ষুর অন্তরালে স্কুল কামাই করিয়া রোগীর পাশে বসিয়া ঘন্টার পর ঘন্টা অবিরাম পাখা চালাইয়াছে, শুশ্রূষা করিয়া রোগীর প্রাণে শান্তি দিতে চাহিয়াছে। রাত্রে গোপনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের পরিচর্যায় বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়াছে এবং অভিভাবকের দৃষ্টি এড়াইতে আবার প্রভাত হইবার পূর্বেই বাসায় আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু যখন তাঁহারা আরোগ্যের মুখে তখন প্রমোদরঞ্জন সেখান

হইতে একেবারেই সরিয়া পড়িল। তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগও দিল না। নাম যশের আতঙ্ক তাহার সত্যই কত বেশি ছিল তাহা এই ঘটনা হইতেই আমরা কতকটা বুঝিতে পারি। এমন নিঃস্বার্থ সেবা কয়জন করিতে পারে?

কাহাকেও সেবা করিবার সুযোগ পাইলে প্রমোদরঞ্জন নিজকে ধন্য মনে করিত। তাহার এই ব্রতীজীবনের অবশ্যম্ভাবী লভ্য ছিল 'হাড়ফাটা' পরিশ্রম আর অভিভাবকের তিরস্কার। লোকসেবার ক্ষেত্র প্রসারকল্পে সে তাহার খেলার-সাথিদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটা ছোটখাটো সেবকদল গঠন করিয়াছিল। উত্তরকালে ইহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ও জনৈক শিক্ষকমহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় স্থানীয় 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের' প্রতিষ্ঠা হয়। প্রমোদরঞ্জন এবং তাহার সঙ্গীরাই মাটি কাটিয়া আশ্রমের ভিত গড়িয়াছে, ভিক্ষা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছে, দুস্থ রোগীর সেবা করিয়া আশ্রমের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষন করিয়াছে। আশ্রমের বার্ষিক উৎসবাদিতে তাহার উৎসাহের অন্ত থাকিত না। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত একটা না একট কাজে লাগিয়াই আছে– ঠাকুরঘর সাজানো ভোগ পাক করা, পরে ভক্তমন্ডলীকে পরিবেশন করা। একটু ফাঁক পাইলে সংকীর্তনের দলে ঢুকিয়া ঠাকুরের নামকীর্তন করা ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠানেই তাহাকে দেখা যাইত। এসব কার্যে তাহার বেশ একটা উৎসাহ ছিলই তদুপরি আবার সাধুমহাপুরুষদের প্রতি তাহার একটা অগাধ ভক্তি ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল।

সেবার কালবৈশাখীর ঝড়ে চট্টগ্রামের নানাস্থানে বিশেষত কক্সবাজারে রুদ্র-দেবতার ধ্বংসলীলার অভিনয় হয়। সমুদ্রের লোনা জলে গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়া যায়। গাছপালা, লোকালয় বা গ্রাম কোথাওবা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কোথাওবা বসুমতীর কোলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে। গৃহপালিত পশুপক্ষীর তো কথাই নাই, মানুষেরও দুরবস্থার সীমা ছিল না, রাস্তাঘাট ভাঙিয়া গিয়া যাতায়াতের পথও দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। দুভিক্ষ-রাক্ষসীর করালছায়ায় পল্লীপ্রাণ কৃষকগণের উৎফুল্ল মুখগুলি ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। অনশনের তীব্র যাতনায় প্রতি গৃহে হাহাকার উঠিয়াছে। সেই সময় দেশপ্রিয় নেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় মাত্র দশজন স্বেচ্ছাসেবক সমভিব্যহারে বন্যাপীড়িত স্থানে উপস্থিত হইলেন। আমাদের প্রমোদরঞ্জন তাহাদের মধ্যে অন্যতম। পথের দুর্গমতা ও সেবকজীবনের অবশ্যম্ভাবী কঠোর পরিশ্রম, উপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের অভাব সেবকদের অনেকেরেই সহ্য হইল না। ৩/৪ দিনের মধ্যেই পাঁচ-ছয়জন দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্রমোদরঞ্জন ও তাহার

অন্তরঙ্গ বন্ধুদের যে তিন-চারিজন এই সেবার কার্যে যোগদান করিয়াছিল তাহারাই নিত্য নতুন অসুবিধা, কঠোরতম পরিশ্রম ও দুর্গমতর পথের দুঃখভোগকে সাদরে বরণ করিয়া অচল অটলভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিল, কখনওবা আর্তের অভাবের ব্যথায়ও তাহাদের চোখের জলে এই তরুণ সেবকদের তরুণ প্রাণ ব্যথায় ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিত। আবার কখনওবা তাহাদের দুঃখের নিরাকরণ করিয়া তাহাদের অভাবক্লিষ্ট শীর্ণ মুখের কোণের ক্ষীণ হাসিটুকু দেখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। এই সময় প্রমোদরঞ্জন যে অক্লান্ত পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিল তাহা ভুলিবার নয়। বন্যাপীড়িত স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া যথাযোগ্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। আবার ক্যাম্পে (camp) ফিরিয়া স্বহস্তে জল টানিয়া, রন্ধন কার্যে সাহায্য করিয়া হাস্যকৌতুকে সকলের দুঃখ ও অসুবিধার লাঘব করিয়াছে। এইরূপে দিনের পর দিন এই তরুণ সেবকদল দেশবাসীর দয়ার দান মাথায় বহিয়া দুঃস্থ দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

এই সময়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রমোদরঞ্জনও একজন পরীক্ষার্থী। পরীক্ষার ফলে উৎকণ্ঠা কত হইতে পারে পরীক্ষার্থী ভিন্ন অন্যলোক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রমোদরঞ্জনের ব্যাপারে কোনোপ্রকার উৎকণ্ঠা বা অধীরতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অথচ সে ইহাও বেশ জানিত যে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে স্থানীয় কলেজে অধ্যয়নের আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে এবং তাহাতে তাহার সুখেরস্বর্গ চট্টল জননীর সঙ্গেও বিচ্ছেদ অনিবার্য।

একদিকে নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতি, সুখ, সুবিধা অন্যদিকে আর্তের দুঃখমোচনের চেষ্টা, পীড়িতের সেবা। এস্থানে তাহার স্বাভাবিক পরোপকারবৃত্তি শ্রেষ্ঠ আসন লইয়া তাহার ব্রতী-জীবনকে সার্থক ও মহনীয় করিয়া তুলিল। যথাসময়ে কর্তব্য সম্পাদনান্তে গৃহে ফিরিয়া প্রমোদরঞ্জন শুনিতে পাইল অঙ্কে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়া সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহার এই আত্মভোলাভাবকে খামখেয়ালি মনে করিয়া অভিভাবকেরা তাহার এই অপ্রত্যাশিত অশোভনীয় বিলম্বের জন্য তাহাকে রীতিমতো ভৎর্সনা করিলেন। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সাথের সাথিদের স্নেহাশ্রয় হইতে চোখের জলে বিদায় লইয়া প্রমোদরঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া সিটি কলেজে আই,এস, সি ক্লাসে ভর্তি হইয়া গেল।

চরিত্রের বিশেষত্ব

'মোরাই ভবের পাগলা-পথিক,

বাদল-রাতের চমক ক্ষণিক

মোরাই আনি সৃজন বাণী–

মোদের কেবা সম্বরে।'

প্রত্যেক অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব, তাহার সভ্যগণের চরিত্রবল, নিষ্ঠা, কার্যক্ষমতা ও আদর্শের প্রতি অনুরক্তির উপরই নির্ভর করে। অনুষ্ঠান যতই বৃহৎ হউক না কেন বিভিন্ন আদর্শের বিভিন্ন চরিত্রের লোক তাহাতে থাকিবেই। বাংলার বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা বিপ্লববাদীদের চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। যথা–

(১) ভাবের স্রষ্টা- উচ্চ আদর্শসম্পন্ন 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দ সদৃশ মহাপুরুষ।

(২) আদর্শ কর্মী- সর্ব বিষয়ে জ্ঞান ও কর্মের অপূর্ব সমাবেশ- যিনি সঙ্ঘের পরিচালক হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন।

(৩) সৈনিকভাবাপন্ন কর্মী- সঙ্ঘের পরিচালক হইবার যোগ্যতা না থাকিলেও যাহারাই আত্মত্যাগে ও বীরত্বমহিমায় জাতির গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করে।

(৪) ভীরুস্বভাব নাম যশাকাঙক্ষী কর্মী- বুকে সাহসের ও স্বদেশপ্রেমের সম্পূর্ণ অভাব স্বত্ত্বেও যাহারা অর্থলোভে ও যশোলোভে বা নিজের অন্যকোনো স্বার্থসাধনের নিমিত্ত সঙ্ঘে যোগদান করিত।

আমাদের প্রমোদরঞ্জন এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মীর তালিকায় নির্বিবাদে স্থান পাইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারাই বিপ্লবসঙ্ঘের প্রকৃত বল। প্রমোদরঞ্জনের চরিত্রের বিশেষত্বও এইখানে। এই শ্রেণীর কর্মীরাই সর্বদেশে, সর্বকালে, বুকের রক্তে স্বদেশকে স্বাধীনতার বেদীতে বসাইয়াছে।

প্রমোদরঞ্জনের চরিত্রের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। প্রাণের সরলতায়, চরিত্রবলে, স্বভাবের মাধুর্যে সে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু

জ্ঞান-বিচার ও যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া কাহাকেও নিজের আদর্শে আনিবার চেষ্টা সে বড়ো একটা করিতে চাহিত না। ইহার প্রয়োজনীয়তা সে না বুঝিত এমন নয়। প্রয়োজনের তাড়নায় চেষ্টা করিতে গিয়াও প্রায় ক্ষেত্রেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিত। ইহা যেন তাহার ধাতেই সহিত না। সে সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভালোবাসিতে পারিত, হৃদয় দিয়া হৃদয় জয় করিতে পারিত, জ্ঞান বা যুক্তি দিয়া নহে। পরাধীন দেশের যুবক দেশের কাছে লাগিবে না কেন– ইহাই তাহার কাছে সব চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার মনে হইত। কাহাকেও বুঝাইয়া, যুক্তিতর্ক দিয়া সঙঘভুক্ত করিবার কথা বলিলে সে বলিত, যাহার প্রাণে সজীবতা নাই তাহাকে যুক্তিতে হারাইলে কি কাজ পাওয়া যাইবে। যাহার জিহ্বার জোর আছে, অকাট্য-যুক্তির ক্ষমতা আছে সে দশজনকে সঙঘভুক্ত করিতে পারিলে করুক, আমার যে সে ক্ষমতা নাই। তাহার এই জাতীয় মন্তব্য হইতেই আমরা তাহার চরিত্রের সরলতার প্রমাণ পাই।

যে বিপ্লবসঙেঘর সঙ্গে প্রমোদরঞ্জন এতদিন যাবৎ অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাকে বিপ্লবসঙঘ না বলিয়া নৈতিক সঙঘই বলা যাইতে পারে। অন্তত প্রমোদরঞ্জনের দৃষ্টিতে তাহা এইরূপই ছিল। তাঁহাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামে সুদূর ভবিষ্যতে বিপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও এই সৈনিকস্বভাব ধীর যুবকের প্রাণ তাহাতে তৃপ্ত হইত না। সদ্য সদ্য একটা কিছু করিয়া কাঁচা মাথা দেওয়ার কল্পনা যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার এই অন্তরঙ্গভাবের বিপ্লবী বন্ধুরা কোনোদিনই সত্যই কাজের বিপ্লবী হইবে কিনা, সেদিনটা আরও কতদূরে, আরও কত যুগ শুধু ভাব প্রচার করিয়া–বা বিপ্লবের গান গাহিয়াই কাটাইতে হইবে, সে অহরহ কেবল এসব চিন্তাতেই বিভোর হইয়া থাকিত।

তাহার ভিতরের সৈনিকভাব অনেক সময় বাহিরেও প্রকাশ হইয়া পড়িত। সুযোগ পাইলে লোকালয়ের বাহিরে দশজনের দৃষ্টি এড়াইয়া, কখনও কখনও দুই চারিজন বন্ধুকে লইয়া সৈনিকের মতো ‘কদম’ ফেলিয়া চলিত, বন্দুক চালনা অভ্যাস করিত। সঙেঘর মধ্যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের আদেশ এবং উপদেশ সে বিনাবাক্যবয়ে পালন করিয়া বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করিত, সৈনিকের আদর্শেই সে তাহার নিজের ও তাহার বন্ধুগণের জীবন এবং চরিত্র গঠনে প্রয়াস পাইত। শৃঙ্খলারক্ষা ও কর্মতৎপরতাই তাহার সৈনিক জীবনের একমাত্র আদর্শ ছিল। তাহার জীবনে ইহার অভাব কোনওদিনই লক্ষিত হয় নাই। সঙেঘর কাহারও মধ্যে ইহার অভাব দেখিলে সে বড়োই মর্মাহত হইয়া

তীব্র ভাষায় শ্লেষ দিত। ছোটোবড় কেহই রেহাই পাইত না। এই স্বল্পভাষী যুবকের স্পষ্টবাদীতায় তাহার বন্ধুরা লজ্জিত হইলেও বিরক্ত হইত না। 'আপনি আচরি ধর্ম জগতে শিখাও' এই নীতিটুকু সে প্রাণে প্রাণে মানিয়া চলিত।

একসঙ্গে পনেরো-বিশ ক্রোশ চলিয়াও সে বড়ো একটা ক্লান্ত হইত না। এমনও দেখা গিয়াছে সারাদিন রোদ-বৃষ্টি মাথায় করিয়া সাইকেল চালাইয়াছে। কখনও বা ৮/১০ ঘন্টা নৌকা চালাইয়া বা ৫/৭ ঘন্টা নদী সাঁতরাইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই সে কাতর হইয়া পড়িত না, বরং এ জাতীয় কাজ পাইলে বড়োই খুশি হইত আর ভাবিত–সত্যিকার বিপ্লবের দিনে এসব কাজ কতই না প্রয়োজনে আসিবে।

এসব ব্যাপার হইতেই আমরা তাহার সৈনিকসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। তাহার ব্যবহারিক জীবনেও যে সে অনেকস্থলে বীরোচিত সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছে এখানে তেমন একটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। সেবার পূজার সময় সে এবং তাহার জনৈকবন্ধু কলেজ ছুটির পর কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম রওয়ানা হইয়াছিল। পূজার সময় গোয়ালন্দ স্টিমারের ভিড়ের কথা কি আর বলিব। এ সময় এক বৃদ্ধ ও তাঁহার যুবতী কন্যা ওই স্টিমারেই যাত্রী। তাঁহাদের সঙ্গে কিছু লটবহরও ছিল। স্টিমার-ঘাটে কুলিদের অত্যাচার সর্বজনবিদিত। এক একটা মোটের জন্য এক টাকা, দেড় টাকা চাহিয়া বসে। শেষে হয়তো দু'চার আনাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়, ইহাই স্টিমার-ঘাটের সনাতন নিয়ম। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকও যথানিয়মে কুলি বিদায় করিতে চাহিলে কুলিদের সঙ্গে তাঁহার খানিকটা বচসা হয়। যুবতী মেয়েটি পিতার পক্ষ অবলম্বন করিলে কুলিদ্বয় অবশেষে মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া এমন কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করিল যে তাহাতে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'অসভ্য বর্বর, যা মুখে আসে তাই বলছিস, যা কিছুই পাবি না'। এতক্ষণ কুলিদের ৫/৭ জন, বৃদ্ধ ও যুবতীটিকে ঘেরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। হঠাৎ দুর্দান্ত কুলিদের একজন জোর করিয়া মেয়েটির অঞ্চল হইতে পয়সা কাড়িয়া লইতে গিয়া তাহাকে একেবারে নিরাভরণ করিবার চেষ্টা করে। অন্যান্য কুলিরাও হুমকি দিয়া বৃদ্ধকে আক্রমণ করে। বিপদ বুঝিয়া যাত্রীগণ স্ব স্ব লটবহর লইয়া ত্রস্তপদে একদিকে সরিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। গোলমাল শুনিয়া আমাদের প্রমোদরঞ্জন ও তাহার বন্ধুবর চকিতে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তাহারা গায়ের জোরে প্রথমে মেয়েটিকে কুলিদের

কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সঙ্গে রীতিমতো মারামারি আরম্ভ করিয়া দিল। বন্ধুটি বৃদ্ধ ও তাঁহার মেয়েকে আগলাইয়া রহিল। প্রমোদরঞ্জন অমিতবিক্রমে কুলিদের আক্রমন প্রতিহত করিয়া ক্ষিপ্ত কুলিদের উপর দুইখানা ছাতা ভাঙিল, কোমরের বেল্ট খুলিয়া মারিয়া তাহাও ছিঁড়িয়া ফেলিল। তারপর সমানে ঘুসি চালাইতে আরম্ভ করিল। এই বিপুলকায় ভীমদর্শন সাহসী যুবকের প্রহারের কাছে কুলিরা তিষ্ঠোতে না পারিয়া পলায়ন করিল। বলাবাহুল্য কুলিদের প্রহার করিতে গিয়া তাহারও যথেষ্ট প্রহার লাভ করিয়াছিল। আশু উত্তেজনার বেগ প্রশমিত হইলে তাহারা দেখিল তাহাদের মাথা ও শরীরের নানাস্থান কাটিয়া গিয়াছে। তাহার জীবনে এরূপ আরও দু'চারিটি ছোটোখাটো সংঘর্ষ স্থানীয় গুন্ডাদের সঙ্গে হইয়া গিয়াছে।

তাহার জীবনের আর একটা বিশেষত্ব ছিল সর্ববিষয়ে সরলতা। সাধারণত বিপ্লবকর্মীদিগকে নানা- প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয় বলিয়া তাহারা অনেকসময় সকলের সঙ্গে খোলামনে খোলাপ্রাণে চলিতে পারে না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসহকারে বিশেষরকম পর্যবেক্ষণ করিয়া সবিশেষ জানিয়া শুনিয়া বিচার করিয়া তাহারা বিশ্বাসের পাত্র মনোনীত করেন। কিন্তু আমাদের প্রমোদরঞ্জন তাহার স্বভাবসুলভ সরলতামাত্র পাথেয় করিয়া সঙ্ঘের কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল। অবশ্য এইজন্য তাহাকে অনেকেক্ষেত্রে ঠেকিতে ও ঠকিতে হইয়াছে। বুদ্ধি দিয়া বিচার না করিয়া উন্মুক্ত হৃদয় দিয়া মানুষকে বুকে টানিবার ব্যর্থ প্রয়াসে সে কতদিন হতাশ হইয়াছে। অনেক ধূর্ত, কপটাচারী তাহার সরলতার সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহার জীবনে একটা তীব্র দহন জ্বালাইয়া দিয়াছে। একান্ত অন্তরঙ্গ ব্যতীত কেহই সে খবর রাখে না। কিন্তু সে পাহাড়ের মতো সকল ঝড়, ঝঞ্ঝা সকল প্রতিকুলতাকে বুক দিয়া প্রতিরোধ করিয়া প্রাণের সাধনায় অবিচলিত হইয়া রহিয়াছে; তাহার অকপট সরলতার জন্য সঙ্ঘের নায়কেরা মাঝে মাঝে তাহাকে তিরস্কার করিলেও সকলে মনে মনে তাহার আপনভোলা ভাবের কাছে সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইত, আর ভাবিত এ মানুষ না দেবতা।

অস্ত্র আইনে গ্রেপ্তার

'মুক্তি পথে চলব গেয়ে অগস্তেরি যাত্রাগানে,

সিদ্ধিলাভে লক্ষ্য রবে দধীচির সে আত্মদানে।'

প্রমোদরঞ্জন কলিকাতায় আসিয়া লেখাপড়া আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে তাহার সদা শুভার্থী আত্মীয়-স্বজন একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছে এই আশায় যে কলিকাতার আবহাওয়ায় যদি তাহার স্বদেশি ভাবটুকু এবার ঘুচে। তাহাদের হিসাবে তাহার স্বদেশি আবহাওয়া তো ঘুচিলেই এমনকি স্বদেশির বহিরাবরণ খদ্দরটাও বোধ হয় এবার ঘুচিবে। বড়োলোকের ছেলে, কলিকাতার কলেজ হোস্টেলে থাকিলে লেখাপড়া হউক আর না হউক চালচলন শিখিবে। চালচলনে ভদ্রস্তত হইবে ইহা একেবারে খাঁটি কথা। বাবুত্বের পাশে বীরত্বের স্থান ক্কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কলিকাতার জলবাতাসেও অভিভাবকের ঈপ্সিত কোনো গুণ তাহার মধ্যে পরিলক্ষিত হইল না। দায়ে পড়িয়া বা প্রয়োজনবোধে তাহার পোশাকের স্বদেশিয়ানার একটু পরিবর্তন ঘটিলেও তাহার স্বদেশের পায়ে উৎসর্গীকৃত জীবনের সত্য সত্যই কতটুকু পরিবর্তন হইয়াছিল ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া আমরা এবার তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

সেদিন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক বিশেষদিন। মোটরে মোটরে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় পুলিস কর্মচারী মহাব্যস্ততা সহকারে উত্তর-কলিকাতার দিকে ছুটিয়াছে। এ যেন এক যুদ্ধের অভিযান। এত ঘটা করিয়া পুলিস কোথায় শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে ছুটিল- কলিকাতাবাসী একটা আতঙ্কপূর্ণ ঔৎসুক্যে তাহার সংবাদের অপেক্ষায় রহিল। যথাসময় দিবা ১০/১২ ঘটিকার সময় শহরময় প্রচারিত হইয়া গেল- দক্ষিণেশ্বরের কোনো একটা ভাড়াটিয়া বাড়ি হইতে নয় জন শিক্ষিত বাঙালি যুবক বোমা, পিস্তল ও অন্যান্য মালমশলা সহ ধৃত হইয়া লালবাজারে আনীত হইয়াছে।

বোমা পিস্তলের নামে জনসাধারণের মনটা বড়ো প্রসন্ন হইল না। কেহ বলিল, 'ধরা পড়িয়াছে তো ভালোই হইল। তা না হলে না-জানি কি সর্বনাশের কাণ্ডটাই করিয়া বসিত।' কেহ সমবেদনার সহিত বলিল, 'আহা এরা স্বদেশি–

দশজনের মঙ্গলের জন্যই তো নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিল।' কেহ বলিল, 'দূর ছাই, স্বদেশি হইল কি এমন পোষা বিড়ালটির মতো ধরা দেয়,' কেহ বা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বলিল, 'ও কিছুই না, হয়তো সমস্তই পুলিসের কারসাজি।' সারাদিন এখানে সেখানে অতিসন্তর্পনে এরূপ আলোচনা ও মন্তব্য চলিতেছিল। এমনই সময় সন্ধ্যার প্রাক্কলে শোভাবাজারের কোনো একটা বড়ো ভাড়াটেবাড়িতে এক ক্ষুদ্রপ্রকোষ্ঠ হইতে আরও দুইজন বাঙালি যুবক রিভলভার, টোটা ও অন্যান্য মালমশলা সহ দক্ষিণেশ্বরের সম্পর্কে ধৃত হইল। যুবকদের মধ্যে একজন আমাদের প্রমোদরঞ্জন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম অনন্তকুমার চক্রবর্তী।

এখন প্রমোদরঞ্জনের এই অবস্থায় ধৃত হওয়ার কারণ নির্ণয় করা যাক। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে অর্ডিন্যান্সের অপপ্রয়োগে যখন বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলার আদর্শ কর্মীগণ ধৃত হইয়া সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপে কারাগৃহে বিশ্রামলাভ করিতেছিলেন সেই সময় এখানে সেখানে দু-একজন বিপ্লবী নেতা কৌশলে পুলিসের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়া ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি ঠিক করিতেছিলেন। তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে দেশব্যাপী একটা বিরাট বিপ্লবান্দোলনের আয়োজন করিতেছিলেন কিনা এবং তাহাতে কার্যত কতখানি করিবার সামর্থ তাহাদের ছিল আমরা এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব না।

যাঁহারা উপরোক্ত উপায়ে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ২/১ জন শোভাবাজারের বাড়িতে প্রমোদরঞ্জনের আশ্রয়ে বাস করিত। প্রমোদরঞ্জন এ সময়ে তাহার প্রাণের চাওয়ার মতো ক্ষেত্র পাইয়া সোৎসাহে পাচকের কার্য হইতে আরম্ভ করিয়া দিবারাত্র সৈনিকের মতো তাহাদের আদেশপালন করিবার সুযোগ পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিতে লাগিল। আমরা শুনিয়াছি শোভাবাজারে পুলিস হানা দেওয়ার পরও সে ইচ্ছা করিলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই সময় তখনকার দিনের এক বিশিষ্ট 'ফেরারি' বিপ্লবকর্মী তাহার আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। সেনাপতির জীবন রক্ষার্থে সৈনিকের আত্মদান-নীতি অবলম্বন করিয়া কৌশলে তাঁহাকে সরাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে গিয়া সে আত্মরক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হইয়াছে দেখিয়া সে পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পন করিয়াও সোয়াস্তি বোধ করিয়াছিল। একেবারে নিষ্ঠাবান সৈনিকের আদর্শে এমন অপূর্ব আত্মদান বাংলাদেশের বৈপ্লবিক ইতিহাসে সত্যই বিরল।

প্রায় দুই-বৎসর হইল প্রমোদরঞ্জন তাহার বড়ো সাধের চট্টলভূমি ও অতিপ্রিয় বন্ধুবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতা আসিয়া সে বিপ্লবসঙেঘর সঙ্গে তাহার পূর্বসম্বন্ধ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল কি না তাহা আমরা বলিতে পারিব না। উত্তরকালে বিচারালয়ে সরকারপক্ষ হইতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা যদি সত্য বলিয়াই ধরিয়া নেওয়া যায় তাহা হইলে কতকগুলি বিষয়ের কার্যকারণ সম্বন্ধ বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে সামরিক বলে বলীয়ান বিদেশি-সরকার সুশাসন ও শান্তিরক্ষার দোহাই দিয়া যখন বাংলাদেশের হৃদয়বান প্রতিভাসম্পন্ন যুবকগণকে বিনাবিচারে কারাগারে কুক্ষিগত করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন হয়তো পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত তৃতীয়শ্রেণীর তালিকাভুক্ত বীরভাবাপন্ন যুবকেরা ভবিষ্যতের আশায় হতাশ হইয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই বেআইনি আইনের অপপ্রয়োগের একটা যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়তো কতকগুলি হৃদয়বান যুবক বিভিন্ন সঙঘ হইতে আসিয়া এক সঙঘভুক্ত হইয়াছিল। অসহিষ্ণু প্রমোদরঞ্জনও হয়তো এই নবগঠিত সঙেঘর একজন বিশিষ্টকর্মীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।

এখানে বুদ্ধি দিয়া তাহাদের ভুলভ্রান্তির বিচার করিয়া লাভ নাই। হৃদয় দিয়া তাহাদের হৃদয়কে বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমরা আশায় বুক বাঁধিতে পারি যে, দেশের দুর্দিনেও এমন এক শ্রেণীর লোক উঠিয়াছিল, যাহারা মরণ-কামড়ে অবিচারীর বিচার করিতে চাহিয়াছিল। হইতে পারে তাহারা নিঃসম্বল, নিঃসহায়, নায়কহীন, বিচারবুদ্ধিহীন কিন্তু তাহারা হৃদয়হীন নহে। এইজাতীয় বীরেরাই যেকোনও দেশের গৌরব। ক্ষেত্র পাইলে, সুপথে চালিত হইলে ইহারা প্রাণের সাধনায় অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিত। স্বাধীনদেশে এই বীরেরা ছোটোবড়ো সকলের শ্রদ্ধার পূজা পায়। পরাধীনদেশে যেখানে আইনের আবরণে বেআইন চলে বীরপুজাও সে দেশের আইনে বাধে।

বিচরালয়ে (বোমার মামলায়)

‘ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চিরচেনা!

ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা?

কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত;

তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত!’

বহু বৎসর পরে আবার আলিপুরে বোমার মামলার শুনানি হইতেছে। একাদশজন শিক্ষিত বাঙালিযুবক নিঃশঙ্ক অবস্থায় আসমির কাঠগড়ায়। উৎসুক জনসঙঘ শঙ্কিত ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে একবার ভালো করিয়া তাহাদের কচি মুখগুলি দেখিয়া লইল। সকলে নির্বাক-বিস্ময়ে তাহাদের তরুণ হৃদয়ের শঙ্কাহীন ভাবটাও লক্ষ্য করিল। অভিযুক্ত যুবকেরাও এই প্রথম দেশবাসীর দৃষ্টিতে স্নেহের ও সমবেদনার অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া নীরব-হাসিভরা দৃষ্টির বিনিময়ে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। এ দৃষ্টির অর্থ কেহ বুঝিল কেহ বুঝিল না। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে শঙ্কাকুলচিত্তে বিচারের ফলাফলের অপেক্ষায় রহিল।

কিন্তু অভিনব বিচারব্যবস্থা দেখিয়া সকলে প্রমাদ গণিল। বিচার হইবে স্পেশ্যাল-ট্রাইবুন্যালে (Special Tribunal) সরকারপক্ষের মনোনীত, সরকারের পিণ্ডভোজী তিনজন বিশিষ্ট জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটশ্রেণীর বিচারক দ্বারা এই স্পেশ্যাল-ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়াছে। এই বিচারের অভিনয়ে কতদূর সুবিচার হইতে পারে তাহাও দেশবাসীর বুঝিতে বাকি রহিল না।

ডাকাতি, নরহত্যা ইত্যাদি সাঙঘাতিক অপরাধে অভিযুক্ত দুর্দান্ত অপরাধীর জন্যও জুরির বিচারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহাই এদেশের সনাতন নীতি বা আইন। সরকারের প্রতিষ্ঠিত আদালতে সরকারের প্রণীত আইনে দোষীর বিচার হয়। কিন্তু এ যে, এক যাত্রার পৃথক ফল। শিক্ষিত, নিরপেক্ষ, বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের মধ্য হইতে ৫/৭ জন মনোনীত ব্যক্তির দ্বারা গঠিত এদেশের সাধারণ-আইন সম্বলিত জুরির বিচার না হইয়া এই তরুণ যুবকদের বিচারের জন্য বিশেষ-আইন মতে বিশেষ বিচারকের দ্বারা বিশেষ বিচারের ব্যবস্থার মধ্যে কতটুকু সেকালের ঘৃণিত ‘কাজির বিচারের’

স্বেচ্ছাচারিতার ছাপ আছে তাহা দেশবাসী সেদিন ভালোমতেই বুঝিয়াছিল- আর বুঝিয়াছিল যে, যাহারা উচ্চশিক্ষা ও সুশাসনের গর্ব করে তাহাদের সত্যিকার স্বরূপটা কি।

আবার এই অভিনব বিচারে পুলিসের লোকেরাই প্রধান সাক্ষী তবুও আসামিপক্ষের ব্যারিস্টার সাক্ষীগণকে জেরা করিয়া প্রয়োজনবোধে আইন উদ্ধৃত করিয়া প্রাণপণে সুবিচার লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু সময়ে-অসময়ে সরকারপক্ষ অপ্রয়োজনে, অকারণে বাধা দিতে লাগিলেন। ভাবের মুখে একাধিকার বলিয়া বসিলেন, 'মনে থাকে যেন এটা জুরির বিচার নয়।' এই স্পষ্ট ইঙ্গিতের অর্থ এই যে জুরির বিচারে স্বাধীন বিবেকবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া জুরি মাঝে মাঝে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রমাণাভাবে নির্দোষ বলিয়া মুক্তি দিয়া থাকেন। কিন্তু Special Tribunal-এ বিকৃত (বিক্রীত?) বিবেক বুদ্ধিতে অভিযুক্তের দোষের প্রমাণ-অপ্রমাণের স্থান কোথায়? তাহার শাস্তি যে অবধারিত। এই নিস্করুণ বিচারাভিনয়ের ফল পূর্বাহ্নেই অনুমিত হইয়াছিল। কাজেও হইল তাহাই। জজের অপূর্ব লেখনী হইতে যথাক্রমে দশ বৎসর, সাত বৎসর, পাঁচ বৎসর ও তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডের রায় বাহির হইয়া গেল। আমাদের প্রমোদরঞ্জনও পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ লাভ করিল। অভিযুক্ত যুবকেরা বন্দেমাতরম ধ্বনিতে সরকারের বিচারব্যবস্থাকে ও বিচারকগণের বিচারবুদ্ধিকে সম্বর্ধনা করিল। শৃঙ্খলিত হস্তোত্তোলন করিয়া তাহারা সমবেত দর্শকমন্ডলীকে শ্রদ্ধার অভিবাদন জানাইল এবং সান্ত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া হাসিমুখে বিচারগৃহ ত্যাগ করিল। জনসাধারণ তাহাদের মধুর মুখগুলির উপর আর একবার ব্যথাভরা দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের বুকের ব্যথা চোখের জলে ফুটিয়া উঠিল।

কারাজীবন

'বাঁধন-ঘেরা খাঁচায় পোরা থাকবে না আর তারা
মুক্তি তাদের ডাক দিয়েছে ভাঙবে লোহার কারা।'

প্রমোদরঞ্জন ও তাহারা সঙ্গীরা তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। কয়েদির পোশাকে, কয়েদির আহারবিহারে জেলের অবশ্যম্ভাবী দুঃখ কষ্ট সহিতে সহিতে স্মৃতি ও স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহাদের দুঃখের দিনগুলি একপ্রকার কাটিয়া যাইতেছিল। অবশ্য দুঃখের দিনের দীর্ঘতা পরস্পরের সঙ্গলাভের সুযোগে তাহারা বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে পারিল না। রোদবৃষ্টি মাথায় করিয়া নিয়মিত খাটুনি খাটিয়া অবসর সময় এই কয়বন্ধুতে বিশেষ করিয়া 'প্রমোদরঞ্জন' হাস্য কৌতুকে বৈচিত্র্যহীন কারাজীবনের একঘেয়েমি দূর করিবার প্রয়াস পাইত।

গতজীবনের ব্যর্থতার স্মৃতি সময়ে সময়ে তাহাদের প্রাণে ঘা দিত। কিন্তু সবচাইতে বেশি ঘা দিত মানুষের তীব্র সমালোচনা। অবস্থায় পড়িয়া চারিদিকের তাড়নায় তাহারা তাহাদের স্বভাবকোমল হৃদয়কে বজ্রকঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। রসনাকে সংযত নির্বাক করিয়া সকলপ্রকারের প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে ব্যথাভরা বুকে বরণ করিয়া লইল। যাহারা ঘা দিতে আসিল তাহারা এই পাথরের মানুষগুলির নির্বাক অবহেলায় আপনার প্রাণেই আপনাদের কথার প্রতিধ্বনি শুনিল মাত্র।

তাহাদের দুঃখের জীবন দুঃখেই অতিবাহিত হইতেছিল। কারাজীবনের অবশ্যম্ভাবী অসহনীয় দুঃখকষ্টের করুণ কাহিনী বিবৃত করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। লাঞ্ছিত দেশপ্রাণকর্মীদের বন্দিজীবনের দুঃখকষ্টের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইতিহাসের আজকাল আর অভাব নাই। এ যুগের বাঙালি পাঠকবৃন্দ এসব কারাজীবনের সঙ্গে পরিচিত আছেন এটুকু আশা করিতে পারি না কি? আমরা শুধু সংক্ষিপ্ত কথায় এই বলিব, 'এ দেশের রাজদণ্ড যমদণ্ডকে হারাইয়া দিতে পারে।' কাজেই এই স্বদেশসেবী হৃদয়বান যুবকেরা 'নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে' উঠিতে বসিতে কতখানি লাঞ্ছনা সহিতেছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে ইহার অসহনীয় তীব্রতায় একবার তাহারা অনুশনে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। ইহাতে তাহারা দু'একটা সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু আখেরে তাহাও টিকিল না। একদিন বিকালবেলা জেলের সুশৃঙ্খলপূর্ণ ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়া এক অভাবনীয় কান্ড ঘটিয়া বসিল।

সেদিন গোয়েন্দাবিভাগের স্বনামখ্যাত স্পেশ্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই জেলের রাজবন্দিদের সঙ্গে গল্পগুজব করিয়া বেলাশেষে তাহাদের প্রাচীরঘেরা বাসস্থানের বাহিরে আসিলেন। আহা! তখনও তিনি কল্পনা করিতে পারে নাই যে সেদিনের সেই বেলাশেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের বেলারও চিরতরে অবসান হইবে। পথেই Bomb Yard-এর (দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দন্ডিত আসমিদের বাসস্থান) অতি সন্নিকটে তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুটাইতেছিল। কে বা কাহারা এমন সুকৌশলে এই অপূর্ব শৃঙ্খলার মধ্যেও এমন বিশৃঙ্খল কাণ্ডটা ঘটাইয়া বসিল আজও নিঃসন্দেহরূপে তাহার মীমাংসা হইয়াছে কি?

জেলের কর্তৃপক্ষ খবর পাইয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিলেন। যথাসময়ে পাগলাঘন্টি (alarm bell) পড়িল। পুলিসের লোকেরা আসিয়া ভুপেনবাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ হাসপাতালে প্রেরণ করিল। কিন্তু এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। বিশেষজ্ঞেরা শব পরীক্ষা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন শাবল বা এই প্রকারের কোনো কঠিন লৌহদণ্ডের আঘাতেই তিনি আহত ও নিহত হন।

ইতিমধ্যে হত্যাকারী আবিস্কারের চেষ্টার কোনও ত্রুটি হইল না। সাধারণ পুলিস কর্মচারী হইতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জোর তদন্তের ব্যবস্থা করিলেন। গোয়েন্দা বিভাগের চুনোপুটি হইতে নামজাদা রুই-কাতলা পর্যন্ত সকলেই এই তদন্তে যোগদান করিল। জেলের সাধারণ কয়েদি হইতে সিপাহী, শাস্ত্রী পর্যন্ত তাহাদের জেরার মুখে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। প্রলোভন, ভয়-প্রদর্শন ইত্যাদি পুলিস তদন্তের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানও সমানে চলিতে লাগিল। Bomb Yard-এর নিকটেই এ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া সকলের সন্দেহাকুল দৃষ্টি বিশেষভাবে Bomb Yard-এর কয়েদিদের উপরই পতিত হইল। গোয়েন্দা বিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারীরা বিশেষরূপে আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া এই Yard-এ ঢুকিয়া পড়িল। রীতিমতো তল্লাসি, জেরা, ভয়-প্রদর্শন চলিতে লাগিল। যে সান্ত্রী এই যুবকদের পাহারায় নিযুক্ত ছিল অবশেষে তাহাকেই সরকারি সাক্ষীরূপে পাওয়া গেল।

এই লোকটিই Bomb Yard-এর লোকেরাই এই নৃশংস হত্যাকান্ডের নায়ক বলিয়া ঘোষনা করিল। তাহার সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই, 'ইহাদের মধ্যে কয়েকজন তাহাকে পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া সবলে ফটকের চাবি কাড়িয়া নিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। আর কয়েকজন লৌহদণ্ডহস্তে বাহির হইয়া গিয়া অল্পক্ষনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।' তাহার এই সাক্ষ্যেই তদন্তের একটা কিনারা হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোককে

'লৌহদন্ডধারী' বলিয়া সনাক্ত করিয়াছিল। আমাদের প্রমোদরঞ্জনও সেই চিহ্নিত লোকদের মধ্যে একজন।

প্রমোদরঞ্জন ও তাহার সঙ্গীরা অনশনব্রতের ফলে যে সামান্য সুবিধাটুকু লাভ করিয়াছিল এই ঘটনার পর হইতে তাহাও হারাইল। অধিকন্তু প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কারাকক্ষে আবদ্ধ হইয়া রহিল। বড়োই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত জোর তদন্তের ফলেও কোনও প্রকার লৌহদণ্ডের আবিস্কার হইল না। কিন্তু তাহাদের স্থানান্তরিত করার দু'একদিন পরেই মৃত্তিকাগর্ভ হইতে এক বিচিত্র শাবল আবিস্কৃত হইল। বলিহারি তদন্ত! ইহাতে নিরপেক্ষ জনসাধারণের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে না কি?

ভুপেনবাবুর হত্যার ব্যাপারে পুলিস মহলে একটা বিরাট আন্দোলন ও একটা অস্পষ্ট আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই হত্যাকাণ্ড জেলের ভিতর 'লৌহদন্ডাঘাতে' না হইয়া যদি কলিকাতা নগরীর বুকের উপর রিভলভারের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বাংলাদেশের যুবজনের প্রাণে একটা উত্তেজনা, একটা রোমান্স সৃষ্টি করিতে পারিত। এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিস মহলের আতঙ্কটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিত। তখন প্রত্যেকেই হয়তো প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিবার সময় ভাবিত, 'না জানি আমার অদৃষ্টে আজ কি আছে।' এই আতঙ্ক ও উত্তেজনার ফলে, লাভের মধ্যে এই হইত যে বিনাবিচারে অবরুদ্ধ রাজবন্দিদের দীর্ঘ তালিকায় আরও কয়েকটি অঙ্কপাত হইয়া যাইত।

যাহা হউক, প্রাচীর-ঘেরা জেলের মধ্যে এমন সাঙ্ঘাতিক কার্যটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেলে তাহার ভাবটুকু কথঞ্চিৎ মোলায়েমভাবেই বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। দেশের লোকের কাছে ইহা 'গোয়েন্দা হত্যার' উত্তেজনা লইয়া আসে নাই। নৃশংস নরহত্যার আবরণেই আসিয়াছিল। তাই দেশের লোক সমবেদনায় বলিয়া উঠিল, 'আহা!' বুদ্ধিমান লোকেরা ভাবিল, 'ইহা বঞ্চিত-প্রাণের সঞ্চিত-বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ নয় তো?'

মোটের উপর যে যাহাই ভাবুক না কেন আসলে জনসাধারণ এই হত্যাকার্যটাকে শ্রদ্ধার বা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই এবং এভাবে এই নৃশংস হত্যাকান্ডের নায়কেরা একটা উচ্চাঙ্গের স্বাদেশিকতার পরিচয় দিয়াছে বলিয়াও দেশবাসী মনে মনে তাহাদিগকে সম্বর্ধনা করে নাই– করিতেও পারে না।

কিন্তু যে বা যাহারা নিমিষের মধ্যে এমন অভাবনীয় গুরুতর কাণ্ডটা ঘটাইয়া অপূর্ব সুকৌশলে অলক্ষিত অবস্থায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিল বায়োস্কোপের ফিলমের মতো তাহাদের এমন অত্যাশ্চর্য ক্ষিপ্রকারিতার প্রশংসা না করিয়া কেহ পারে নাই। দেশবাসী অবাক বিস্ময়ে ভাবিয়াছিল, 'এমন সিদ্ধহস্ত সুচতুর নির্ভীক লোকগুলি কারা?'

বিচারালয়ে (হত্যাপরাধে)

'আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন- রোল

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,

অত্যাচারীর খ□□□ কৃপাণ

ভীম-রণভূমে রনিবে না–'

আলিপুরে আবার স্পেশাল ট্রাইবুন্যেল বসিয়াছে। কৌতুহলী দর্শকমন্ডলীতে বিচারগৃহ পরিপূর্ণ। পুলিসের ধাক্কা ধমক খাইয়াও মানুষের উৎসাহ ভঙ্গ হইতেছে না। যথাসময়ে সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া শৃঙ্খলিত অভিযুক্ত আসামিরা ধীরে ধীরে বিচারগৃহে প্রবেশ করিল। সমবেত দর্শকমন্ডলী চকিতে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া 'চেনামুখ' দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, 'একি! আবার এরাই কি হত্যাকারী?' – প্রমোদরঞ্জন ও তাহার সঙ্গীরা সকলে প্রফুল্লমুখের করুণ হাসিতে দর্শকমন্ডলীকে অভিবাদন করিল। তাহাদের প্রশান্ত মুখের সৌম্যভাব ও অচঞ্চল চক্ষুর শান্ত দৃষ্টিতে সকলে বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া ভাবিল, 'আহা এরাই যদি, নৃশংস হত্যাকারী হয় তবে কোমলপ্রাণ প্রেমিক কাহাকে বলিব?' বয়সের তরুণতায়, দৃষ্টির স্নিগ্ধতায় সকলের প্রাণ তাহাদিগের দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদেরই মঙ্গল কামনায় আকুল হয়িা উঠিল। কিন্তু বিচারব্যবস্থা দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়া গিয়াছিল। কারণ এই পসদিনমাত্র এই হতভাগ্য যুবকদের অদৃষ্ট দিয়াই সকলে এবম্প্রকার বিচার-অভিনয়ের তিক্ত-অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। এই নিরাশার অন্ধকারেও ক্ষীণ আশার আলোক সকলের কল্পনাকে একটু দোলাইয়া দিল। সকলে একবার ভাবিল, 'বিচারকেরা সকলেই বাঙালি- এদেশের আলো-বাতাসে বর্ধিত সঞ্জীবিত বাঙালি সাহেব-জজের মতো নির্মম হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতে পারিবে কি?'

যথাসময়ে সরকারপক্ষের ব্যারিস্টারমহাশয় সগর্বে গাত্রোত্থান করিয়া সম্ভব-অসম্ভব যক্তি সহকারে এই যুবকগণকে অভিযুক্ত করিয়া হত্যাপরাধের একটা বিবরণ বিবৃত করিলেন। ভুপেনবাবু মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকালীন এজাহার করিয়া যাইবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার জনৈক বন্ধু গোয়েন্দা পুলিস-কর্মচারী হলপ করিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে ভুপেনবাবুর মুখে তিনি বহুবার শুনিয়াছেন যে এই

বোমার মামলার আসামিরা তাঁহাকে দেখিলেই গান ধরিত 'কবে তোকে যমে নিবে।' বলা বাহুল্য, আমরা কিন্তু শুনিয়াছি সত্যই ইহাদের একজন মাঝে মাঝে কৌতুক করিয়া গাহিত,

'তোমার নেয় না কেন যম,

কত লোকের গোরু মরে

তোমার বেলায় একি ভ্রম'

যাহা হউক, ভুপেনবাবুর এই বন্ধু ব্যক্তির কথা যদি সত্যও হয় তাহা হইলে এই গানে ভূপেনবাবুর মৃত্যুকামনা সূচিত হয় মাত্র। কিন্তু মৃত্যুকামনা করা আর হত্যা করায় কতখানি পার্থক্য তাহার বিচার বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ করিবেই। অবশ্য সরকারি বিচারকদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

যে সান্ত্রীটির নিকট হইতে ফটকের চাবি কাড়িয়া নেওয়া হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ সে তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নপ্রকার উক্তিই করিয়াছে। 'স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যেলের' সম্মুখে একেবারে মুখস্ত কথার মতো এই দশজন যুবকের প্রত্যেককে এই হত্যাব্যাপারে সংশ্লিষ্ট করিয়া একটা চরম উক্তি করিয়া বসিল। বলাবাহুল্য জেলের দুর্লভ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা বেশ জানেন এই অল্প বেতনভোগী দুঃস্থ সান্ত্রীদিগকে সামান্য বখশিসে কত আইন বিগর্হিত কার্য করানো সম্ভবপর হয়।

অতঃপর অন্য দুইজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। প্রকাশ তাহারা উভয়েই প্রত্যক্ষদর্শী কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উক্তি করিয়া বসিল। এই হত্যা-ব্যাপারে উক্ত দশজন যুবককে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া লইলমাত্র। বলাবাহুল্য ইহারা উভয়েই ইংরেজ কয়েদি। জাল, জুয়াচুরি হইতে আরম্ভ করিয়া কোনও প্রকার গর্হিত কার্য ইহাদের বিবেকে বাধে না। এই ভবঘুরে লোকগুলির জেলখানাটাই একটি সঠিক ঠিকানা ও আশ্রয়স্থল। যাহা হউক এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়ার ফলে তাহারা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেবারকার মতো মুক্তিলাভ করিয়াছিল।

বলিহারি বিচারব্যবস্থা! এজাতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্যও এক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইল। আবার আসামিপক্ষের সুযোগ্য ব্যারিস্টারের জেরার মুখে সাক্ষীদের অবস্থা যাহা হইয়াছিল এবং তাহারা যে অসংবদ্ধ জবানবন্দি দিয়াছিল জুরির বিচার হইলে এই মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে ফাঁসিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কারণ সেখানে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরই প্রাধান্য দেওয়া হয় । বিদ্বেষ বা

পক্ষপাতের স্থান সেখানে নাই। কিন্তু ইহা যে বিচার নয়- বিচারের অভিনয় মাত্র। কাজেই আইনজ্ঞ বিচারকের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা সরকারি বিচারকগণের কানে পৌঁছাইলেও প্রাণে পৌঁছাইল না।

যথাসময়ে সুযোগ্য বিচারকগণের নির্ম্মম লেখনী হইতে রায় বাহির হইল, তাঁহারা সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন প্রমোদরঞ্জন, অনন্তহরি মিত্র ও বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফাঁসির হুকুম হইল এবং অবশিষ্ট সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ দেওয়া হইল। একজন লোকের হত্যার সন্দেহে তিনজনের মৃত্যুদণ্ড ও সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর! উঃ কি ভয়াবহ বিচার!

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতম বিচার দেখিয়া জনসাধারণ প্রমাদ গণিল। তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে কি করিয়া বাঙালি জজের বুকের ভিতরও হৃদয় বলিয়া পদার্থটার একান্ত অভাব ঘটিল। ক্ষোভে, দুঃখে হয়তো সেদিন তাহারা ভগবানের কাছে যুক্ত করে প্রার্থনা করিয়াছিল, 'প্রভো! বাঙালি কসাই হউক আপত্তি নাই, বাঙালি যেন কোনওদিন জজ না হয়।'

বিচারকদের রায় শুনিয়া এই নির্ভীক বেপরোয়া যুবকেরা হর্ষভরে বিচারকগণকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল। তাহারা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছিল এই তাহাদের শেষ মিলন। সেই হৃদয়বিদারক করুণ দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। নির্বাক দর্শকমণ্ডলী বেদনা-ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া করুণ দৃষ্টিতে তাহাদের শঙ্কাহীন বীরগর্বোজ্জ্বল তরুন মুখগুলি আর একবার দেখিয়া লইল।

এদিকে প্রমোদরঞ্জন ও তাহার সঙ্গীরা করুণ স্বদেশিগানে মুর্ছিত প্রাণে চেতনা সঞ্চার করিয়া সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত কয়েদির গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কয়েদির ভারে ভারাক্রান্ত গাড়ি রাস্তা কাঁপাইয়া, ততোধিক সকলের হৃদয় কাঁপাইয়া মুহুর্তে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল।

ফাঁসির প্রতীক্ষায়

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।'

সেদিন সন্ধ্যায় বিচারালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রমোদরঞ্জন সম্পূর্ণভাবে জেলের নির্জনতার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিল।

প্রমোদরঞ্জন, অনন্তহরি, বীরেন্দ্রনাথ তিনজনই ফাঁসির আসামি। যথা নিয়মে তাহাদিগকে অন্যান্য আসামি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কারাকক্ষে **(Solitary Cell)** আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহাদিগকে এই অপরিসর ক্ষুদ্র কক্ষে সর্বক্ষণ আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত। বাহিরের আলো বাতাসের সঙ্গেও তাহাদের সম্বন্ধ রহিল না। আহারাদির এমন কি বাহ্য-প্রস্রাবও এই 'জেলের' মধ্যে সারিয়া লইতে হইত।

এই সঙ্গহীন, কর্মহীন, বহির্জগতের সঙ্গে এমনকি আলো-বাতাসের সঙ্গেও সম্বন্ধহীন জীবন–মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণতর–দুঃসহ। দিনের পর দিন এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও তাহাদের মুখে কোনোদিন কাতরতার ম্লান ছায়া দৃষ্ট হয় নাই। সদাপ্রসন্ন মুখগুলি দুঃখের তীব্রদাহনে যেন আরও উজ্জ্বল, আরও মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল।

যথাসময়ে হাইকোর্টের বিচারের চরমফলও বাহির হইয়া গেল। অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম বহাল রহিল। জজেরা বীরেন্দ্রনাথকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশিষ্ট যে সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে মাত্র তিনজনের (১। শ্রীযুত ধ্রুবেশ চন্দ্র চ্যাটার্জি, ২। শ্রীযুত অনন্তহরি চক্রবর্তী, ৩। শ্রীযুত রাখালচন্দ্র দে) পূর্ব দন্ডাজ্ঞা বহাল রহিল। নৃশংস হত্যার নৃশংসতম দণ্ডটি এবার নৃংশংসতর অবস্থায় নামিয়া আসিল।

হাইকোর্টের চরম সিদ্ধান্ত শুনিয়া প্রমোদরঞ্জন এবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। উদ্যত রাজদন্ড আজ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়া তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে–ইহাতে সে বড়োই গর্ব অনুভব করিল। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া তাহার চিত্তের প্রফুল্লতা যেন শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। উল্লাসভরে চিৎকার করিয়া সে তাহার বন্ধুগণকে ডাকিয়া বলিল, 'ওহে একটা সুখবর শোনো–আমার ফাঁসির

হুকুম বহাল রয়েছে।' তাহার এমন আকুল কণ্ঠস্বরে ইহাই সূচিত হইল যেন বহুকালের বহুসাধনার পর আজ তাহার চিরবাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান মিলিয়াছে।

আজিকার এই ব্যাপারে তাহার শৈশবকালের একটা ভুলে যাওয়া ঘটনার স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়া উঠিল। তখন তাহার বয়স সবেমাত্র দশ-এগারো বৎসর। একজন জ্যোতিষ তাহার কোষ্ঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এ ভবিষ্যতে একটা অসাধারণ কিছু করিয়া বসিবে। এ রাজদ্রোহী হইবে- এর কপালে অখন্ডনীয় রাজদণ্ড লিখা আছে।' জ্যোতিষের এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া আত্মীয়স্বজনেরা মর্মাহত হইলেন। কিন্তু অবোধ বালক তাহার কপালে রাজদন্ড আছে শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে নাচিতে তাহার সমবয়সী খেলার সাথীদের গিয়া বলিল, 'ওরে তোদের কোষ্ঠিতে যা নেই আমার কোষ্ঠিতে তা আছে–আমার নাকি রাজদণ্ড আছে।' এই বয়সে রাজদণ্ডের নির্মম গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মতো জ্ঞান তাহার ছিল কিনা আমরা বলিতে পারি না। তবে সকলের কোষ্ঠিতে যাহা নাই বিশেষ করিয়া তাহার কোষ্ঠিতে তাহা আছে এই অসাধারণত্বটুকু হয়তো সে বুঝিয়াছিল।

যাহাহউক ফাঁসির হুকুম পাইয়াও প্রায় দুই-মাসেরও অধিক তাহাকে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠের অবশ্যম্ভাবী কষ্টের মধ্যে ফাঁসির প্রতীক্ষায় কাটাইতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার মনের প্রফুল্লতা এতটুকুও হ্রাস পায় নাই। বরং তাহার ফাঁসির হুকুম নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হওয়ার পর হইতেই তাহার দেহের ওজন পর্যন্ত বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সুস্থ সবল মন সত্যই ক্কচিৎ দৃষ্ট হয়।

শেষ দিন

দেশমাতৃকার মুক্তিসাধনায় আসুরিক শক্তিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদীর কঠোর বজ্রকে যাহারা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর পথে অমরতা লাভ করিয়াছে আমাদের প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। হাইকোর্টের চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার পর তাহারা উভয়েই নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে বসিয়া অধীর আগ্রহে দিন গুনিতেছিল, কবে তাহাদের সেই চিরবাঞ্ছিত শুভদিনটি আসিবে।

সেদিন ইংরাজি ২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬। তাহারা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের নির্জন কারাকক্ষে বসিয়া শরৎ সন্ধ্যার সৌম্যমূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছিল। এমনই সময় খবর আসিল আজিকার এই শেষ রাত্রে ৫ ঘটিকার সময় তাহাদের ফাঁসি হইবে। যাহারা এই নিদারুণ সংবাদটুকু বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহারা ব্যথায় সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া নিতান্ত অস্ফুটস্বরে অস্পষ্ট ভাষায় সংবাদটি তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিতেছিল মাত্র। কিন্তু এদিকে এই নির্মম সংবাদটুকু যাহাদের পক্ষে নিদারুণ মর্মঘাতী হইবার কথা তাহার ইহাকে অতিশয় মনোজ্ঞ হৃদয়গ্রাহী বলিয়াই গ্রহণ করিল। তাহাদের স্বভাব গম্ভীর মুখ চোখ হইতে উজ্জ্বল আনন্দরেখা ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল। বদ্ধ গরাদের ফাঁক দিয়া শুধু একবারমাত্র জীবনের শেষ সন্ধ্যার রক্তোজ্জ্বল আকাশের পানে তাকাইয়া লইল। তারপর প্রমোদরঞ্জন সোৎসাহে তাহার সঙ্গীগণকে ডাকিয়া বলিল, 'ওহে আজ শেষ রাত্রে আমাদের ফাঁসি হবে।' এই নির্মম সংবাদে বিভিন্ন কক্ষস্থিত বন্ধুগণ ক্ষণমাত্র বিচলিত হইয়া নীরবে বুকের ব্যথা চাপিল মাত্র। পরক্ষণেই হৃদয়ে বলসঞ্চয় করিয়া একজন উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'বন্দেমাতরম'। বন্দিদের প্রতিকক্ষ হইতে যুগপৎ ধ্বনিত হইল 'বন্দেমাতরম'। প্রমোদরঞ্জনের মূক মুখেও আজ ভাষা ফুটিল। সে সিংহনিনাদে দিগন্ত কম্পিত করিয়া হাঁকিল, 'বল ভারত মায়ি কি জয়'। সকলে সমস্বরে হাঁকিয়া উঠিল 'ভারত মায়ি কি জয়'। এদিকে গত স্বদেশিযুগের বোমার মামলায় দন্ডিত আন্দামানপ্রত্যাগত যুবকদের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল 'বন্দেমাতরম' সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের রাজবন্দিরাও হাঁকিয়া উঠিলেন 'বন্দেমাতরম' 'প্রমোদরঞ্জনকি জয়', 'অনন্তহরিকি জয়'। প্রমোদরঞ্জন সাধ্যমতো গলা চড়াইয়া বজ্রনিনাদে কারাগৃহ কম্পিত করিয়া হাঁকিয়া উঠিল- 'বল ভারত মায়ি কি জয়'। এবার সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল 'ভারত মায়ি

কি জয়'। এই ফাঁসির উৎসবে সন্ধ্যা হইতে ভোর পর্যন্ত অবিরাম জয়ধ্বনি ও স্বদেশিগান চলিতে লাগিল।

রাত্রির ক্রুরতায়, নীরবতায় সরকারের সর্বধর্মসমন্বয়কারী অতিথিশালার সহিত উপকথায় বর্ণিত দৈত্যপুরীর কোনও পার্থক্য সাধারণত থাকে না। সেই নীরবতার বুকে সারাদিনের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পর একটি তীব্র বেদনা ও পরবর্তী প্রভাতের কঠোরতার স্মৃতি বুকে করিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করে। কাহার বুকে কতখানি জ্বালা অতীতের সুখস্মৃতিকে ছাপাইয়া উঠিয়া একটা নির্মম ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছে সেই নীরবতার মধ্যে অন্ধকারের মধ্যে একান্ত নিভৃতে মনের সাথে তাহার হিসাব-নিকাশ হয়। দৈত্যপুরীর দ্বাররক্ষকদের করুণা ভিক্ষা করিবার সুযোগও রাত্রির অন্ধকার দিয়া থাকে। কাজেই সেই ঘুমন্ত দৈত্যপুরী সবারই বুকের পাপতাপের বোঝা লইয়া তাহার অধিবাসীদের বুকে একটা নীরব ভীতি জাগাইয়া রাখে। কিন্তু আজিকার এই অভিনব ব্যাপারে দৈত্যপুরীতে নন্দনের আনন্দোল্লাসে আত্মহারা আত্মভোলা হইয়া তাহারাও হাঁকিয়া উঠিল 'বন্দেমাতরম'। সেই মর্মস্পর্শী দৃঢ়কণ্ঠের বন্দেমাতরম ধ্বনি আশাহতের বুকেও আশার সঞ্চার করিল। চিরলাঞ্ছিত ভীত কয়েদির বুকেও সাহসের তীব্রতা জাগাইয়া দিল। আজ সকলেই বিনিদ্ররজনী যাপন করিয়া মৃত্যুজয়ীদের সংবর্ধনা করিতে করিতে মরণোৎসবে মাতিয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাত্রিশেষে জেল-কর্তৃপক্ষগণ আসিয়া যথানিয়মে হাইকোর্টের চরম নির্ধারণ শুনাইয়া দিল। প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি কতক উল্লাসে কতক উপেক্ষায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা যেন একেবারে ফাঁসির জন্য প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া আছে । কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ামাত্র চকিতে বাহিরে আসিয়া সিপাহি-সান্ত্রী ও জেল কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'কোথায় যাইতে হইবে শীঘ্র চল'। এই মরণ-উৎসবের মহাযাত্রীদের উল্লাস ও আগ্রহ দেখিয়া সকলেই অবাক বিস্ময়ে তাহাদের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। একজন আসিয়া তাহাদিগকে যথানিয়মে নূতন কয়েদির পোশাক পরাইয়া দিল আর একজন হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে যুক্ত করিয়া হাতকড়ি লাগাইয়া দিল। প্রমোদরঞ্জন এই সময়েও একবার কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আর কত সাজাবে'? জেল-কর্তৃপক্ষ ও সিপাহি সান্ত্রীরা যুবকদ্বয়কে এইভাবে 'সাজাইয়া' বধ্যভূমির দিকে লইয়া চলিল। প্রমোদরঞ্জন শুধু একবার মাত্র সে চলার পথে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাথের সাথিদের একজনকে ডাকিয়া বলিল 'সুধা, চললুম রে!' আহা এই চিরবাঞ্ছিত মহাযাত্রার পথে এইটুকুন ছোটো কথার ভিতর দিয়া

কতখানি বেদনা এই একজন বন্ধুর মারফত তাহার অন্তরঙ্গ ও সাথের সাথিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ঢালিয়া দিয়া গেল!!!

তারপর উচ্চকণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনিতে জেলখানা মুখরিত করিয়া মুক্তির আনন্দে উভয়ে ছুটিতে ছুটিতে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে উত্থিত মুর্হুমুহু 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি তাহাদের দ্রুতগতিকে যেন আরও দ্রুততর করিয়া দিল। যেসব সান্ত্রীরা তাহাদিগকে ধরিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল তাহারা বরং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। মরণযাত্রীর এমন বিজয়গর্ব তাহার এই প্রথম দেখিল।

প্রমোদরঞ্জন ছুটিতে ছুটিতে সর্বাগ্রে বধ্যভূমিতে প্রবেশ করিয়া শুধু একবার মাত্র বলিল, **'ভারত মাতার মুক্তি চাই!'** তারপর একলম্ফে ফাঁসিমঞ্চের উপর উঠিয়া এমনি সগর্বে বীরের মতো দাঁড়াইয়া মৃত্যুর বুকেও ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিল। এদিকে অনন্তহরি যে স্থানে 'ভুপেনবাবুর' সংজ্ঞাহীন দেহ ধূলায় লুটাইয়াছিল মুহূর্তকাল শুধু সে স্থানটার উপর সগর্বে দাঁড়াইয়া যেন একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। তারপর প্রমোদরঞ্জনকে না দেখিয়া অধিকতর দ্রুতবেগে বধ্যভূমির দিকে ছুটিল। প্রমোদরঞ্জন তার একটু আগে যাইবে ইহাও যেন তাহার সহ্য হইতেছিল না। এ যে মৃত্যুপথের প্রতিযোগিতা 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।'

এই বধ্যভূমির উপরেই একটি দ্বিতল গৃহে রাজবন্দিদের বাসস্থান নির্দিষ্ট ছিল। তাঁহারা বীরপূজার যাবতীয় আয়োজন করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের গৃহ হইতে বাতায়ন পথে ধুপ-ধুনার গন্ধ আসিয়া বধ্যভূমিকে যজ্ঞভূমি করিয়া তুলিল। একজন রাজবন্দি উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া বলিল, 'ফুল দাও, ফুল দাও।' অমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি অসংখ্য চন্দন চর্চিত পুষ্প, পুষ্পমালা বীরযুগলের উদ্দেশ্যে বাতায়নপথে বাহিরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল 'বন্দেমাতরম' 'ভারত মায়ি কি জয়।' রাজবন্দিরা তাহারাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিলেন 'বন্দেমাতরম' 'ভারত মায়ি কি জয়।' ঘাতক আসিয়া তাহাদিগকে মঞ্চের উপর পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দিল। প্রত্যেকের পদদ্বয় শৃঙ্খলিত করিয়া গলায় ফাঁসির রজ্জু বাঁধিয়া দিল। রাজবন্দিরা চোখের জলে এই মুক্ত বীর যুগলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া কম্পিতকণ্ঠে বিদায়-অভিনন্দন সঙ্গীত গাহিয়া উঠিলেন, 'মাতৃভূমির সন্তান বীর আবার আসিও ফিরে।' বীর যুগল নিশ্চল

অবস্থায় বীরের মতো স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া শত্রুর প্রাণেও ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিল। কর্তৃপক্ষের ইঙ্গিতমাত্র ঘাতক শিকল টানিয়া দিল। তাহারা শুধু আর একবার মাত্র জন্মের শোধ মাতৃপূজার আমোঘমন্ত্র **'বন্দে মা...... '** পর্যন্ত উচ্চারণ করিতে পারিল। তারপর সব শেষ। মুহুর্তে সব অদৃশ্য হইয়া গেল। শূন্য ফাঁসিমঞ্চ তাহার সর্বনাশী ক্ষুধা লইয়া বৃটিশ শাসনের কীর্তি ঘোষণা করিতে ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল!!!

ইহাদের পূর্বে এ দেশের অনেক বীর যুবক রাজদ্রোহের অপরাধে এইরূপে হাসিমুখে ফাঁসি বরণ করিয়াছে সত্য কিন্তু এমন হৃদয়গ্রাহী সম্বর্ধনা- এমন প্রাণপূর্ণ সহানুভূতি-এমন স্বদেশি আবহাওয়া কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তখন ফাঁসিমঞ্চ দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিলে চোখে পড়িত-দুর্ভেদ্য কঠিন কারাপ্রাচীর– ততোধিক কঠিনতম নির্মম হৃদয়সম্পন্ন শত্রুসঙ্ঘ। বিজয়ীবীর শত্রুপুরীতে–শত্রুমহলে–শত্রুঘাতকের হস্তে নিঃসঙ্গ–একা। কিন্তু আজিকার এই ব্যাপার সম্পূর্ণ অভিনব–অভূতপূর্ব–করুন, মর্মস্পর্শী। শত্রুর মহলে মিত্রের সম্বর্ধনা, প্রিয়তম সাথের সাথিগণের আকুল স্নেহদৃষ্টি, প্রিয়জনের চোখের জলে বিদায়সম্ভাষণ- সর্বশেষে এমন সহানুভূতির, সমবেদনার আবহাওয়ায় মৃত্যুবরণ।

যাহাদিগকে দুনিয়ার বুক হইতে একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে সরকারের এত আড়ম্বর, এত আয়োজন তাহারা স্বীয় বীরত্বের মহিমায় তাহা একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিল। চট্টলের যুবক প্রমোদরঞ্জন আজ গোটা বাংলাদেশের বীর প্রমোদরঞ্জন হইয়া রহিল। নদীয়ার কর্মবীর অনন্তহরি আজ বাঙালিজাতির আদর্শ কর্মবীর হইয়া সারাদেশের বুক জুড়িয়া রহিয়া গেল।

উপসংহার

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান।'

বাংলার বিপ্লব-যজ্ঞের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরাম এক শুভক্ষণে যে চিররুদ্ধ দ্বার উদঘাটন করিয়া দিয়া গিয়াছে, কানাই, সত্যেন, যে দুর্লভ দুর্গম পথকে আরও সুলভ সুগম করিয়া দিয়াছে, সেদিনকার গোপীনাথ যে মহাযাত্রার পথে আকুল আগ্রহে স্পষ্ট সঙ্কেতে বাংলা মায়ের বীর সন্তানকে আহ্বান করিয়া গিয়াছে আজ সে পথেই নিজেদের বুকের ঝড়ে ঝড় তুলিয়া ছুটিয়া গেল দুইটি অগ্নিগোলক। কাহারও মুখের পানে তাকাইল না, কাহারা পড়িয়া রহিল একবার পিছন ফিরিয়াও চাহিয়া দেখিল না। শুধু দু'টি কথায় প্রাণের চাওয়ার একটা সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতমাত্র দিয়া গেল 'ভারত মাতার মুক্তি চাই।' মুক্তি-সাধকের এই মর্মস্পর্শী আকুল আহ্বান কয়জনের হৃদয় স্পর্শ করিল কে জানে!

যাহারা গিয়াছে তাহারা গিয়াছে। এক্ষেত্রে তাহাদের কৃতকর্মের ভালো মন্দ সমালোচনা করিয়া তাহাদের স্বর্গগত আত্মার অবমাননা করিবার মতো হীনতা আমাদের নাই। শুধু ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া আমরা আজ বলিব- হে ভবিষ্য ভারতের মুক্তিপথিক। আজ সত্যই তোমার ভাবিবার দিন আসিয়াছে– 'মুক্তি কোন পথে?' ভাবের মুখে উত্তেজনার মুখে মরীচিকায় সাগর ভ্রম করিও না। গতানুগতিকের মোহ কাটাইয়া সত্যপথের সন্ধান করো। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়া ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করিয়া চলো। এক যাত্রায় পৃথক ফলের সম্ভাবনা কোথায়? মনে থাকে যেন শুধু বকুভরা সাহস, সদিচ্ছার প্রেরণা ও অসম্ভবের পায়ে নির্বিচারে আত্ম বলিদানই মুক্তিপথের একমাত্র পাথেয় নহে। চাই– সর্ব বিষয়ে অনন্তজ্ঞান, অপূর্ব বিচক্ষণতা, অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও অবিচলিত নিষ্ঠা। আজ উচ্ছ্বাসের আসনে যুক্তিকে বসাও, বিসর্জনের আসনে প্রতিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠিত করো। ভারতের মুক্তি-সাধনায় যাহারা আজীবন তিলে তিলে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিবে না-শুধু ভাবের মুখে বুক-জোড়া অসহিষ্ণুতা ও অধৈর্য লইয়া ঝড়ের মতো আসিয়া ঝড়ের মতোই চলিয়া যাইবে তাহারাই বরং জাতীয় মুক্তি পিছাইয়া দিবে। হে ভবিষ্য ভারতের মুক্তিকামী বীর-সাধক। তোমার অশ্রান্ত গতির মুখে এই নির্মম সত্যটুকু একবার প্রণিধান করিয়া দেখিবে কি?

বন্দেমাতরম

পরিশিষ্ট

প্রমোদরঞ্জন কেমন নিশ্চিন্ত আরামে ফাঁসির প্রতীক্ষায় তাহার শেষের দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছিল তাহার অগ্রজ শ্রীযুত অসিতরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের নিম্নোক্ত উক্তি হইতেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারি–

'ইংরেজির ২১ শে জুন, ১৯২৬ প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরির ফাঁসির হুকুম হয়। ফাঁসির হুকুম শুনিয়া তাহারা গাহিয়াছিল-

'মরিব তোমারই কাজে বাঁচিব তোমারই তরে।
না হলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার।
থাক প্রাণ যাক প্রাণ জন্মভূমি মা আমার।'

এই মহাপ্রয়াণের দিনের জন্য তাহাদিগকে সুদীর্ঘ তিন মাস নির্জন প্রকোষ্ঠে একাকী অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। অবশ্যম্ভাবী এই মৃত্যুদিন তাহাদের মনে সর্বদা জাগরূক থাকা সত্ত্বেও তাহারা কিরূপ নিশ্চিন্ত মনে ও হাসিমুখে দিনগুলি কাটাইয়াছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

অমি প্রায়ই প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। মধ্যে মধ্যে অনন্তহরির সঙ্গেও পুলিস কর্তৃপক্ষের কৃপায় দর্শনলাভ ঘটিত। উভয়কেই খুব প্রফুল্ল দেখিতাম। তাহারা হাসিমুখে স্থিরচিত্তে আমার সহিত আলাপ করিত এবং আমার প্রশ্নাদির জবাব দিত। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান প্রিয়দারঞ্জন একদিন প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'দাদা আপনারা এমন অকালে মৃত্যু-কামনা করেন কেন?'

তদুত্তরে প্রমোদরঞ্জন বলিয়াছিল– 'কই না, মরণ কামনা আমরা করি নে– তবে মরণ–ভীতিও আমাদের নেই।' এই বলিয়া স্বামীজির একটা কবিতা আবৃত্তি করিল–

'ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়,
দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন।
মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল।
অমৃতত্ব বৃথা অকিঞ্চন।'

ফাঁসির হুকুম হইবার পর হইতেই তাহাদিগকে বহুদিন Condemned Cell- এ রাখা হইয়াছিল। সে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। একখানা ছোট্টো কুঠুরি সেখানে একটা পাকা বেদী খাটের কাজ করে। বালিশও সে রকমই পাকা বাঁধানো। কুঠুরির দরজা লোহার গরাদ দেওয়া। সামনে একখানি ছোটো বারান্দা। তারপরেই একখানা ৫/৬ হাত পরিমিত বাঁধানো উঠোন। তারপর পাকা দেওয়াল। এই পর্যন্ত তার সীমা, খাওয়া দাওয়া এমন কি বাহ্য-প্রস্রাবও সে অল্পপরিসর কুঠুরির ভিতরেই সারিয়া লইতে হইত। সেই কুঠুরি দৈর্ঘে ৪ হাত, প্রস্থে ৪ হাত। স্নানের সময় দিনে একবারমাত্র সামনের সেই ছোটো উঠোনে আসিতে পারিত।

একদিন জেল-দারোগা ও একজন বিশিষ্ট সি.আই.ডি. কর্মচারীর সঙ্গে প্রমোদরঞ্জনকে দেখিতে যাই। সঙ্গে আমার দুই একজন আত্মীয়স্বজনও ছিল। গিয়া দেখি সে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজ জেল দারোগা ডাকিল, 'পরমোদ, বাবু, পরমোদ বাবু।' অমনি সে জাগিয়া উঠিয়া এক-পা দুই-পা অগ্রসর হইয়া দরজার লৌহদণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিশাল বপু, দীর্ঘ শ্মশ্রু, (ক্ষৌর কর্মের অভাবে তাহা কয়েক মাসে বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল) পরণে কয়েদির জাঙিয়া দেখিয়া মনে হইল যেন সুপ্ত সিংহ জাগিয়া উঠিয়াছে। আমার একজন আত্মীয় তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। শেষে প্রমোদ তাঁহাকে মানুষের নশ্বরত্ব সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিবার পর তিনি কোনোমতে শান্ত হন, ও সাহস করিয়া দুই-চারিটি কথা বলেন। আমার সঙ্গেও দেশ ও দশের সম্বন্ধে সে নানা কথা আলোচনা করিয়া স্থিরচিত্তে ও ন্যায় যুক্তিতে তাহার মনোভাব জানাইতে সচেষ্ট হইয়াছিল।

মনে পড়ে আর একদিনের কথা। তার পরদিনই তাহাদের ফাঁসির দিন নির্ধারিত হইয়াছিল। তাহার cell এর কাছে গিয়া দেখিলাম সে উবু হইয়া বেদীর উপরে শুইয়া আছে, পাশেই মাথার কাছে একটা ছোটো গীতা, তাহার উপর দুই তিনটি রক্তজবা, দেখিয়াই মনে হইল সে পূজার আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে।

আমি প্রমোদরঞ্জন ও অনন্তহরি উভয়ের সঙ্গেই আলাপ করিলাম। অনন্তহরিকে বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম। তাহাদের কিছু বলিবার আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে প্রমোদরঞ্জন বলিতে লাগিল–

'বলবার মতো বিশেষ কিছু নেই, মাকে সান্ত্বনা দেবেন, এবং আপনি আমার দোষ-ত্রুটি-অপরাধ মার্জনা করবেন। আমার অনুরোধ দেশের ও দশের মঙ্গলসাধন করতে যথাসাধ্য সচেষ্ট হবেন। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করবেন যেন আমাদের অপূর্ণ কাজ অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ হয়। আর আমাদের সম্বন্ধে বলি, আমাদের এই নশ্বর দেহের মাত্র বিনাশ হবে, আমাদের আত্মা তাহার বাসনা তৃপ্তির জন্য পুনরায়

এ দেশেই ভিন্ন কায়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং আমরা আবার আপনাদের হয়ে আপনাদেরই সুখ দুঃখের ভাগী হব।'

অনন্তহরি বলিল, "আপনি প্রমোদের যেমন দাদা আমারও দাদা, আমার অনুরোধ আপনি আমাদের জন্য শোকাকুল না হয়ে মাকে সান্ত্বনা দেবেন ও তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন আমরা মায়ের জন্যই যাচ্ছি। যে মায়ের 'কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি, তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে' সেই দেশ-মাতৃকার জন্যই আজ আমরা যাচ্ছি, তাঁর জন্যই আবার আসব।" এই বলিয়া তাহারা উভয়ে আমার পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি অযোগ্যতার লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ফাঁসির পূর্বে প্রমোদরঞ্জন একখানি চিঠি লিখিয়া আমাদের পাঠায়। আমার ছোট ভাই প্রিয়দার কাছে নিম্নলিখিত চিঠিখানি লিখিয়াছিল।

সত্যমেব জয়তে।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, কলিকাতা।

আদরের ভাইটি,

আজ আমার এই শেষ প্রীতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ কর। আমার জন্য মোটেই বিচলিত হইবে না।

Some will love thee, some will hate thee...... am I to commit suicide?...... ইহাই হয়তো আমার জীবনের শেষ পত্র। মাকে সান্ত্বনা দিস, ও দাদাকে দেখিস। তিনি তাঁহার এই জীবনে বাল্যবধি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন। এই অবশিষ্ট জীবনে যাহাতে শান্তি পান তাহার চেষ্টা করিস।...

ক্ষুদ্র পরিবারের বাহিরেও সারা দেশ জুড়িয়া একটা বিরাট পরিবার রহিয়াছে– তাহার প্রতি নিজের কর্তব্যের যেন ত্রুটি না হয়, আমি একজন যাইতেছি, তাতে কি? তোর তো আরও হাজার হাজার ভাই আছে। তাহারাই তোদের সুখ দুঃখের সহায় হইবে।

বিভূপদে তোদের মঙ্গল প্রার্থনা করি। বিদায়, ইতি–

তোরই আদরের–

দাদা।